অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি

Written in conformity to C. U. Pre-University and Burdwan University Entrance Syllabus in "Elements of Economics and Civics"

অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি

[প্রথম ভাগ : অর্থবিদ্যা (**Economics**)
দ্বিতীয় ভাগ : পৌরবিদ্যা (**Civics**)]

শ্রীশোভনলাল মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., ডি. ফিল.,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ.,
ডিপ. ইন সোস্যাল স্টাডি (এডিন)

শ র ৎ   পু স্ত কা ল য়
৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শরৎ পুস্তকালয়
৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৬১

মূল্য : টা. ৫·০০ (পাঁচ টাকা)

মুদ্রক :
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

॥ কয়েকটা কথা ॥

বাজারে বহু খ্যাতনামা লেখকের ভাল ভাল Economics and Civics-এর বই থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ছোট বইখানি লেখার দুঃপ্রয়াস করলাম কেন সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার মনে করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Pre-University বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের Entrance পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি-কাল অত্যন্ত অল্প এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের একেবারে নতুন অনেকগুলি বিষয় আয়ত্ত করতে হয়। স্বভাবতঃই তারা একটু ভয়ে ভয়ে কলেজে প্রবেশ করে। তার ওপর প্রত্যেক বিষয়েই যদি তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই পড়তে হয় তাহলে প্রথম থেকেই তারা পরীক্ষায় ভাল ফল করা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে। তাছাড়া নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছি, প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্যগুলি সহজ-সরল করে বুঝিয়ে ছোট করে পরিবেষণ করতে পারলেই ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে আয়ত্ত করতে ও মনে রাখতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই বইখানি তৈরী করেছি। আমাদের এই বইখানি আকারে ছোট হলেও, এতে C U. Pre-University বা B. U. Entrance পরীক্ষার্থীদের যতটুকু তত্ত্ব-তথ্য জানা প্রয়োজন সবই দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে যা Degree Class-এ গিয়ে জানলেও চলে তেমন অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাখ্যায় বইখানির কলেবর বা ভার বৃদ্ধি করা হয় নি। তাছাড়া, কোন প্রশ্নের উত্তরে কী ধরণের আলোচনা পরীক্ষকরা পছন্দ করেন সে সম্বন্ধে কয়েকজন অভিজ্ঞ পরীক্ষকের পরামর্শ ও উপদেশ নিয়েই এতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বইখানির অর্থবিদ্যা-অংশ আদ্যোপান্ত দেখে দিয়ে আমাদের যে সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খুব তাড়াতাড়িতে ছাপার জন্য ভুলত্রুটি কিছু কিছু থাকা সম্ভব। পরবর্তী সংস্করণটি যাতে আরও ভাল করা যায় তার জন্যে অধ্যাপক-বন্ধুদের উপদেশ ও পরামর্শ সর্বান্তঃকরণে চাইছি। ইতি—

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়
বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

কলিকাতা-১২

Syllabus in Elements of Economics and Civics

Group – A

Scope and subject-matter of Economics. National Income and its determinants—Factors of Production. Population. Capital—Factors governing accumulation of Capital. Forms of Business Organisation. Large-scale and Small-scale Industries—Division of Labour. Money—Functions of Money—Functions of Banks—Functions of Central Banks—Changes in Price Level and their effects. Factors governing Demand—Elasticity of Demand—Factors governing Supply and Supply Price. Price Determination. Price Determination under Competition and Monopoly. Determination of Wages. Interest, Rent and Profit. Economic Functions of the Government—Taxation and Expenditure. India's Five-Year Plans in outline with reference to Agriculture, Small Industries, Large-scale Industries, Co-operation and Community Development Projects.

Group—B

The State—its origin and characteristics—Government—Forms of Government—Democracy and Dictatorship—Unitary and Federal Government, Parliamentary and Presidential Government. Organs of Government—Separation of Powers—Bicameralism. Nationality and Nation—Right of Self-determination—Citizenship—Modes of acquiring Citizenship—Rights and Duties of Citizens—Hindrances to Good Citizenship. Relation between Rights and Duties. Law and Liberty—Relation between Law and Liberty. Party System—its merits and defects. Public Opinion—Organs of Public Opinion. Suffrage—Universal Adult Suffrage.

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ : অর্থবিদ্যা (Economics)

অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি

প্রথম ভাগ ঃ অর্থবিদ্যা

॥ অর্থবিদ্যা ॥

ভূমিকা

মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের সূচনা—প্রাচীনতম কাল হইতেই মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে দান গ্রহণ করিয়া তাহার অভাব পূরণ করিতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সমস্ত উপাদান সহজলভ্য ছিল, আদিম মানুষ তাহা দ্বারাই তাহার অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রয়োজন মিটাইয়াছে। কিন্তু আদিম মানুষের অভাব ছিল স্বল্প ও সরল ; সুতরাং সেই অভাব পূরণও ছিল সহজসাধ্য।

আদিম মানুষ ও তাহার অভাব পূরণ

ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার অভাব বাড়িতে লাগিল। ক্রমবর্ধমান অভাব পূরণের জন্য মানুষ তখন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় (barter) সুরু হইল। এই বিনিময়-ব্যবস্থার রূপটি ছিল অনেকটা এই ধরণের : মনে করা যাক, কেহ হয়ত ধান ফলাইত। কিন্তু তাহার কাপড়ের প্রয়োজন হইল। অথচ সে নিজে কাপড় বুনিত না। সে তখন কি করিবে? সে তখন তাঁতীর নিকট গিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান্যের পরিবর্তে তাহার নিকট হইতে উদ্বৃত্ত কাপড় সংগ্রহ করিল। ক্রমে মানুষের জীবন আরও জটিল হইল, অভাব আরও বাড়িল এবং দ্রব্য-বিনিময়ের পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের, সহজ কথায় টাকা-কড়ির, প্রচলন হইল।

দ্রব্য-বিনিময়

টাকা-কড়ি

অর্থ বা টাকাকড়ি যখন বিনিময়ের মাধ্যম হইল তখন হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সূচনা। আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনে মানুষ নানাভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং অর্জিত অর্থ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিয়া সে (অর্থের বিনিময়ে) নিজের প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু যথাসাধ্য সংগ্রহ করে এবং নিজের অভাব মিটায়। তবে কোন মানুষই তাহার যথাসাধ্য-অর্জিত অর্থদ্বারা

তাহার সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে না। সুতরাং অর্জিত অর্থের ব্যবহার বিষয়ে তাহাকে নানা দিক বিবেচনা করিতে হয়। অর্জিত অর্থের যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার দ্বারা প্রধান প্রধান অভাবগুলি মিটাইয়া সর্বাধিক পরিতৃপ্তিলাভই মানুষের উদ্দেশ্য। অর্থবিদ্যা মানুষকে এই উদ্দেশ্য সাধনের সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান দেয়।

মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের সূচনা ও উদ্দেশ্য

অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় (Scope of Economics) : উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যায় যে, অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়সমূহের মূলে আছে মানুষের অভাববোধ। আদিম যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সর্বকালেই মানুষ ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা হইতে সুরু করিয়া সংঘবদ্ধ পরোক্ষ প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার বহু ও বিচিত্র অভাব মিটাইতেছে। ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তাহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য তাহার অভাব মিটান। কিন্তু তাহার কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সে তাহার অভাব কেবল সাময়িকভাবেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে। স্বল্পকালীন পরিতৃপ্তির পর আবার তাহার অভাববোধ জাগে : আবার সে কর্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে তাহার প্রাত্যহিক সাধারণ কর্মজীবনে অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তির চিরঘূর্ণমান চাকা চলিতে থাকে। সহজ কথায়, মানুষের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের ক্রিয়াকর্ম তাহার অর্থোপার্জন ও অভাব-মোচনের জন্য অর্জিত অর্থব্যয় সংক্রান্তই হইয়া থাকে। এই কারণে কেহ কেহ "মানুষের জীবনে অর্থের ভূমিকা আলোচনা"-কে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তির চির-ঘূর্ণমান চাকা

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ আলফ্রেড মার্শাল-এর মতে অর্থবিদ্যায় মানুষের সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণ বা আলোচনা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের গতি বহুমুখী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহাকে কতই না কাজ করিতে হয়। তাহার সমস্ত কাজ টাকা-কড়ির অংকে মাপা যায় না এবং যে-সব কাজ টাকা-কড়ির অংকে মাপা যায় না তাহা অর্থবিদ্যার আলোচ্যও নহে। মাতাপিতার স্নেহ, পুত্রের কর্তব্য প্রভৃতি মানুষের জীবনের অতিমহৎ দিক ; কিন্তু অর্থের দ্বারা এই সমস্ত মহৎ গুণগুলি পরিমাপ করা যায় না। তাই এগুলি অর্থবিদ্যার

অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। অর্থবিদ্যাতে মানুষের কেবল সেই সমস্ত আচরণ আলোচিত হয় যেগুলির পরিমাপ টাকা-কড়ির মাপকাঠিতে করা যায়। আলফ্রেড মার্শাল-এর মতে, "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life."

মার্শাল অর্থকে গৌণ স্থান দিয়া মানুষকে উহার উপরে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের সন্তোষ বিধানই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য। অর্থ এই সাধনার উপকরণ মাত্র।

গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে অর্থনীতি অর্থ বা টাকা-কড়ি অপেক্ষা অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংগেই ঘনিষ্ঠতরভাবে জড়িত।

(১) **বিনিময়ঃ** আগেই বলা হইয়াছে যে বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে অর্থই বিনিময়ের মাধ্যম। সুতরাং অর্থোপার্জন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্র; মূল লক্ষ্য হইল অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অভাব পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ।

(২) **অপ্রাচুর্যঃ** মানুষ অর্থের বিনিময়ে সেই সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ করে যেগুলির সরবরাহ পরিমিত। জল বা বাতাস জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য হইলেও সাধারণ পরিবেশে এগুলির জন্য কাহাকেও কোন প্রকার কষ্ট বা ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না—এগুলি প্রকৃতিদত্ত ও অফুরন্ত। যে-সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ অফুরন্ত নয়, যাহাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট, কেবল তাহাদের ক্ষেত্রেই মূল্যদানের প্রশ্ন উঠে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে জল ও বাতাসের সরবরাহও পরিমিত হইয়া উঠে—যেমন, মরুভূমিতে জল বা হিমালয়ের উচ্চ শৃংগে আরোহণের সময় বাতাস বহুমূল্য সামগ্রী।

কোন দ্রব্যের অপ্রাচুর্য থাকিলে আমরা সে দ্রব্যের ব্যয়-সংক্ষেপ করি। কোন ব্যক্তি তাহার পরিমিত অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্য এমনভাবে সংগ্রহ করে যাহাতে সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করে। অর্থব্যয়ের মত অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি এমনভাবে তাহার সময় ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে যাহাতে সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

ব্যক্তির মত জাতির ক্ষেত্রেও অভাব মোচনের উপকরণের সরবরাহ সীমিত। অথচ অভাবমোচনের দ্বারা সর্বাধিক পরিতৃপ্তি সাধনের সমস্যা প্রত্যেক জাতিরই আছে। প্রত্যেক জাতিকেও তাই বিচার-বিবেচনা দ্বারা

এমন কোন পথ নির্বাচন করিতে হয় যে পথে সমীতি উপকরণ ব্যবহার করিয়াও সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করিতে বা সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণসাধন করিতে পারে।

(৩) **নির্বাচন :** উপরি-উক্ত বিচার-বিবেচনার অর্থই নির্বাচন। দুইটি সমকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সীমিত উপকরণ লইয়া ব্যক্তি বা জাতিকে বিচার-বিবেচনা দ্বারা নির্বাচন করিতে হয় যে, কোন্ প্রয়োজন প্রথম মিটান দরকার। কোন ব্যক্তির খাদ্য ও বস্ত্র এই দুই অভাবের মধ্যে ব্যক্তি তাহার পরিমিত অর্থে প্রথম খাদ্যাভাব মিটাইবে। ভারতবর্ষ বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সীমিত অর্থসংস্থান-হেতু কৃষি উন্নয়নকে সর্বাগ্রাধিকার দিয়াছে।

অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা—পূর্ব আলোচনা হইতে অর্থবিদ্যার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে :

পরিমিত-সরবরাহবিশিষ্ট উপকরণের সাহায্যে বিচিত্র অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যা। এ কথা স্মরণীয় যে অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাই আলোচনা করে। যে মানুষ সমাজসম্পর্ক-রহিত অবস্থায় বনে-জঙ্গলে, পর্বতগুহায় বা কোন নির্জন দ্বীপে বাস করে—যেমন কোন সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির বা দ্বীপে নির্বাসিত রবিনসন ক্রুশোর মত মানুষ—তাহার কাজকর্ম অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। আবার, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার যে অংশ অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না সেই অংশ অর্থবিদ্যার আলোচনার বহির্ভূত।

অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা

অর্থবিদ্যা ধনী-নির্ধন সকলের সমস্যাই আলোচনা করে। অপ্রচুর উপকরণের সাহায্যে মানুষের—তা সে মানুষ ধনীই হউক আর নির্ধনই হউক—সীমাহীন অভাব মোচনের সমস্যা (এ জাতীয় সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা বা economic problem) অর্থনীতির আলোচ্য।

অর্থবিদ্যা কি বিজ্ঞান : বিজ্ঞান শব্দের অর্থ : বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ধরণের বিষয় সম্বন্ধে সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান। সেই সমস্ত বিষয়কে ভালভাবে বিভিন্ন অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অর্থ-বিদ্যাকেও বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রসায়নবিজ্ঞান যেমন কেবল

বিজ্ঞান কি ?

রূপান্তরসাধ্য জড়পদার্থ লইয়া আলোচনা করে এবং পদার্থবিজ্ঞান রূপান্তরহীন জড়পদার্থ লইয়া, তেমনি অর্থবিদ্যাও সমাজবদ্ধ মানুষের কেবল অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্মেরই আলোচনা করে। অতএব অর্থবিদ্যাও একজাতীয় বিজ্ঞান—সমাজবিজ্ঞানের এক শাখা।

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান

অর্থবিদ্যা বিজ্ঞানসমূহের অন্যতম হইলেও ইহার সহিত রসায়ন বা পদার্থ-বিজ্ঞানের পার্থক্য আছে। দুই ভাগ হাইড্রোজেন-এর সহিত এক ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত করিলে জলের উৎপত্তি হয়; ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সর্বদেশে ও সর্বকালে একইভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যা সর্বদেশ ও সর্বকালের জন্য ঐরূপ সুনির্দিষ্ট বিধান দিতে পারে না। ইহার কারণ অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মানুষের আচরণ। চিন্তা ও অনুভূতি অনুসারে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রূপ আচরণ করে—কোন জড়বস্তুর মত মানুষের আচরণ সর্বদা একইরূপ থাকে না। এইভাবে দেখিলে অর্থবিদ্যার সহিত জড়বিদ্যাসমূহের পার্থক্য আছে।

অর্থবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানের পার্থক্য

তবে অর্থবিদ্যাও মানুষের আচরণ আলোচনা করিয়া জড়বিদ্যাসমূহের মতই কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। দাম বাড়িলে চাহিদা কমে—ইহা অর্থবিদ্যার একটি সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হয়ত সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়াই সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। জড়বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তের সহিত অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ: প্রকৃতির সীমিত সম্পদ দ্বারা নিজ অভাব মিটাইতে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা দেশে দেশে ও কালে কালে এক একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে।

শিকারের যুগ

আদিম বন্য মানুষেরা পশু শিকার করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিত। তাহারা বনে-জংগলে বা পর্বত গুহায় বাস করিত। তাহাদের আহার্য-সংগ্রহ ছিল অনিশ্চিত। সংগৃহীত আহার্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তাহারা জানিত না। কাহারও কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না বা জমির উপর কাহারও মালিকানা ছিল না।

কালক্রমে মানুষ পশুপালন শিখিল। ফলে তাহার পক্ষে আহার্য-সংগ্রহ পূর্বাপেক্ষা সহজতর হইল। পশুপালনের যুগেও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। গোষ্ঠীই ছিল জমির মালিক। তবে পশুর পাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইত। সে-যুগেও কাহারও নিজস্ব বাসস্থান ছিল না। গৃহপালিত পশুর খাদ্য একস্থানে দীর্ঘকাল পাওয়া যাইত না। তাই, পশুপালক মানুষ যাযাবর বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইল। তবে মোটের উপর পশুপালনের যুগ শিকারের যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

পশুপালনের যুগ

ঘুরিতে ঘুরিতে বনে-জংগলে আহার্য ফলমূলের সন্ধান পাইবার ফলে আদিম মানুষের জীবন আরও সহজ হইল। ক্রমে যব, গম ও ধান্য আবিষ্কৃত হইল ও মানুষ সে-সব চাষ করিতে শিখিল। মানুষ চাষ করিতে স্বরু করিলে কৃষিযুগ আরম্ভ হইল। ক্রমে লৌহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে চাষের কাজ অনেক সহজ হইল।

কৃষিযুগ

কৃষিযুগের মানুষ চাষের ক্ষেতের কাছে স্থায়ী আবাসের প্রয়োজন অনুভব করে। স্থায়ী আবাস হইতে প্রাচীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

সামন্ততন্ত্র (Feudalism): এই যুগেই প্রথম জমির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। যে একখণ্ড জমি পরিষ্কার করিয়া চাষ করিতে স্বরু করে সেই জমির মালিকানা দাবী করে। কালক্রমে শক্তিশালী অত্যাচারী লোকেরা অপরের জমি কাড়িয়া লইতে ও দুর্বল ব্যক্তিদের দ্বারা জমি চাষ করাইতে লাগিল। এইভাবেই কালক্রমে জমিদার-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে এবং কৃষিযুগেই **সামন্তপ্রথার (Feudalism)** উদ্ভব হয়।

সামন্তপ্রথার উদ্ভব

সামন্ততন্ত্রে জমির মালিক হইল জমিদার। কৃষকেরা জমিদারের অধীনে জমি চাষ করিত। উদ্বৃত্ত ফসল তাহাদের সামন্ত বা জমিদারকে খাজনা হিসাবে দিতে হইত। সামন্তেরা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিত। সামন্ত যুগে সমাজে কারিগর শ্রেণীরও উদ্ভব হয়। কারিগরেরা আপন আপন বাড়ীতে থাকিয়া স্থানীয় সমাজের প্রয়োজনীয় ছোটখাট শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিত।

ক্রমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জটিলতর হইতে থাকে। জমিদারেরা অনায়াসলব্ধ সম্পদ সঞ্চয় করিয়া ধনী হইয়া উঠে। তাহাদের নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি হয় ও সমাজে তাহাদের বিলাসব্যসনের জন্য নানা শৌখিনদ্রব্য প্রস্তুত হইতে

থাকে। স্থানীয় কারিগরদের পক্ষে এই সমস্ত বিলাস-দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব না হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে সেগুলি আমদানী হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে বিলাসদ্রব্য আহরণ করিয়া চাহিদা অনুসারে নানাস্থানে সরবরাহ করা উপলক্ষে সওদাগর বা **পুঁজিপতি** (**Capitalist**) শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সওদাগরেরা প্রভূত অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কারিগর নিযুক্ত করিয়া শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিতে সুরু করে।

সওদাগর বা পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব

ক্রমে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কৃত হয় এবং বাষ্পচালিত কল ও যানবাহনের প্রচলন হয়। বাষ্পশক্তির আবিষ্কারের ফলে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দেয়। বহুল পরিমাণে উৎপাদনে সমর্থ কলকারখানা গড়িয়া উঠে এবং রেল ও স্টিমার প্রভৃতি বাষ্পীয় যান প্রচলিত হইবার ফলে পৃথিবীব্যাপী বাজারের সৃষ্টি হয়। ক্রমে সওদাগরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যেও বিরোধ বাধিতে সুরু করে।

ধনিক-শ্রমিক বিরোধ

অর্থনৈতিক জগতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজও এ অবস্থা চলিতেছে। অর্থবিদ্যায় এ-জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হয় ধনিকতন্ত্র।

ধনিকতন্ত্র (Capitalism): বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই ধনিকতন্ত্র প্রচলিত। জমি আর এখন ক্ষমতার উৎস নয়। যাহাদের পুঁজি বা মূলধন (Capital) আছে তাহারাই ধনিকতন্ত্রে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী।

ধনিকতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়। যাহারা পুঁজির মালিক তাহারাই কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করে এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই তাহারা তাহাদের মূলধন উৎপাদনে নিয়োগ করে। সমাজের উপকার বা অপকারের কথা তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে বিবেচনা করিয়া দেখে না। কালক্রমে এক-চেটিয়া ব্যবসায়েরও উদ্ভব হয়। ধনিকতন্ত্রে জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টনের জন্য ধনী ও নির্ধনের ব্যবধান দুস্তর হইয়া উঠে।

ব্যক্তিগত মালিকানা

জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন

রাশিয়া, চীন ও পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য বর্তমানে ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া **সমাজতন্ত্র** (Socialism) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সমাজতন্ত্র (Socialism) : সমাজতন্ত্র অনুসারে জমি, মূলধন ও অন্যান্য উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই জনগণের মঙ্গল ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য শিল্পোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র জাতীয় আয় জনসাধারণের প্রত্যেকের মধ্যে প্রয়োজন ও গুণ অনুযায়ী বণ্টন করে ও তাহার ফলে ধনী ও নির্ধনের দুস্তর বৈষম্য দূর হয়।

প্রয়োজন ও গুণ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের বণ্টন

মিশ্রতন্ত্র (Mixed Economy) : ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে মিশ্রতন্ত্র গঠিত। ইহাতে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার মালিকানাই থাকে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন থাকে এবং জনগণের মংগলের জন্য বেসরকারী শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করে। মিশ্রতন্ত্রে ধনীর উপর বেশী কর বসাইয়া ধনবণ্টনের বৈষম্য লাঘব করা হয় ; কেউ যেন বেকার না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। জনসাধারণের কল্যাণসাধন মিশ্রতন্ত্রেরও লক্ষ্য। ইহাতে তাই সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা, বৃদ্ধদের ভাতা, অনাথদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা

জনগণের কল্যাণ

অর্থবিদ্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা

প্রত্যেক শাস্ত্রেই কতকগুলি শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থবিদ্যাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। দ্রব্য, ধন (বা সম্পদ), উপযোগ, উৎপাদন, মূল্য, মূলধন প্রভৃতি শব্দ উহাদের প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অর্থবিদ্যায় নূতন দ্যোতনা লাভ করিয়াছে। নিম্নে ঐ সমস্ত শব্দের অর্থবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল।

দ্রব্য (Goods) : যাহা দ্বারা মানুষের অভাব পরিতৃপ্ত হয় তাহাই অর্থবিদ্যায় প্রচলিত বিশেষ অর্থে দ্রব্য। দ্রব্য **বাস্তব** (material) ও **অবাস্তব** (non-material) দুই-ই হইতে পারে। চাল, ডাল, ইত্যাদি বাস্তব দ্রব্য। কর্মদক্ষতা, ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill) ইত্যাদি অবাস্তব দ্রব্য।

বাস্তব ও অবাস্তব দ্রব্য

অপর এক বিভাগ অনুসারে দ্রব্য **মূল্যহীন** (free) বা **মূল্যবান** অথবা

অর্থনৈতিক (economic) হইতে পারে। প্রকৃতিদত্ত অফুরন্ত দ্রব্যসমূহ (যেমন জল, বাতাস)—যাহাদের জন্য সাধারণ পরিবেশে কোনপ্রকার ব্যয় বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না—মূল্যহীন দ্রব্য (free goods)। অপর পক্ষে যে সকল দ্রব্যের সরবরাহ অফুরন্ত নয় এবং চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ সেই সকল দ্রব্যই মূল্যবান বা অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods)।

মূল্যহীন ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

কোন দ্রব্য এক বিশেষ স্থানে বা কালে মূল্যহীন হইলেও অপর এক স্থানে বা কালে মূল্যবান হইয়া উঠিতে পারে। জল সাধারণত মূল্যহীন হইলেও কলিকাতার মত বড় শহরে (যেখানে জলের সরবরাহ জন-সংখ্যার অনুপাতে অপ্রচুর) বা মরুভূমিতে মূল্যবান।

স্থান বা কালগত মূল্য

অন্যভাবে দেখিতে গেলে দ্রব্য **বাহ্যিক** (external) বা **আভ্যন্তরীণ** (internal) হইতে পারে। ঘর-বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি বাহ্যিক দ্রব্য। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলী (যেমন কোন গায়কের সুকণ্ঠ, কোন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা) আভ্যন্তরীণ দ্রব্য।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য

অপর এক ভাবে দ্রব্য **হস্তান্তরযোগ্য** (transferable) এবং **অ-হস্তান্তরযোগ্য** (non-transferable) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বাহ্যিক দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য এবং আভ্যন্তরীণ দ্রব্য অ-হস্তান্তরযোগ্য।

হস্তান্তরযোগ্য ও অ-হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য

ধন (Wealth): যে হস্তান্তরযোগ্য, বাহ্যিক দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইতে পারে ও যাহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ সেই দ্রব্যকে অর্থবিদ্যায় **ধন** (wealth) বলে। কোন দ্রব্য ধন বলিয়া গণ্য হইতে হইলে তাহার চারিটি গুণ থাকিতে হইবে—(ক) অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বা উপযোগিতা, (খ) সরবরাহ বা চাহিদার সীমাবদ্ধতা, (গ) হস্তান্তরযোগ্যতা, এবং (ঘ) বহিরংগতা।

ধনের চারিটি গুণ

(ক) **উপযোগিতা**—কোন বস্তু মানুষের অভাব মিটাইতে না পারিলে কোন মানুষ তাহা লাভ করিতে চাহে না; অর্থাৎ সে বস্তুর কোন চাহিদা থাকে না। যাহার চাহিদা নাই তাহা ধন নহে।

(খ) **সরবরাহের সীমাবদ্ধতা**—অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বা উপযোগিতা থাকিলেই কোন দ্রব্য ধন বলিয়া গণ্য হয় না। দ্রব্যটির সরবরাহ সীমাবদ্ধ

হইতে হইবে, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হইতে হইবে। অনায়াস-লভ্য দ্রব্য ধন নহে। যে দ্রব্য পাইতে শ্রম-নিয়োগ করিতে হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কোন মূল্য দিতে হয় তাহাই ধন। সাধারণ পরিবেশে জল বা বাতাস ধন নহে, কেননা চাহিদার তুলনায় ইহাদের যোগান অপ্রচুর নহে। কিন্তু মরুভূমিতে জল বা পর্বতশিখরে কি সমুদ্রতলে বাতাস ধন হিসাবে গণ্য হইতে পারে; কেননা সেখানে এ-সবের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় একান্তই সীমিত এবং এ-সমস্ত স্থানে এক ফোঁটা জল কি বাতাস পাইবার জন্য মানুষ যে কোন মূল্য দিতেই প্রস্তুত থাকে।

(গ) **হস্তান্তরযোগ্যতা**—কোন দ্রব্য যদি হস্তান্তরযোগ্য না হয় তবে তাহা কেবলমাত্র একজনের—বর্তমান মালিকের—অভাব মিটাইতে পারে। হস্তান্তর করা অর্থে কোন দ্রব্য একস্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া বুঝিলে ভুল হইবে। এখানে হস্তান্তর অর্থে মালিকানা বদল বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের হস্তান্তরযোগ্যতা না থাকিলে কেহ সে দ্রব্য লাভ করিতে অর্থ বা শ্রম নিয়োগ করিবে না। হস্তান্তর-যোগ্যতা না থাকায় কাহারও পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট তাহার নিজের কাছে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হইলেও অন্যের নিকট ধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ঘ) **বহিরংগতা**—যে দ্রব্য কোন মানুষের অন্তর্নিহিত তাহা হস্তান্তর-যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা ধন নহে; যেমন ডাক্তারের দক্ষতা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে উপরিউক্ত চারিটি লক্ষণ না থাকিলে কোন দ্রব্যকেই অর্থবিদ্যায় ধন বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও জাতীয় ধন (Personal, Collective and National Wealth): কোন ব্যক্তির ধনের পরিমাপ করিতে হইলে, সে ব্যক্তির ভোগাধিকারে যে সকল দ্রব্য থাকে (যেমন নগদ টাকা, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, পুস্তক ও অন্যান্য নানা দ্রব্যের উপর রক্ষিত স্বত্ব) এবং ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যেরও হিসাব করিতে হয়। ব্যক্তিগত ধনের পরিমাপ করিতে ব্যক্তিগত ঋণ বাদ দিতে হয়।

ব্যক্তিগত ধন

সমষ্টিগত ধন কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিই সে ধন ভোগ-ব্যবহার করিতে পারে। রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি সমষ্টিগত ধন। ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে এ-সমস্ত অনেকটা প্রকৃতিদত্ত অনায়াসলভ্য দ্রব্যের মত। এ সকল তাহার অভাব মিটায় কিন্তু ইহাদের জন্য তাহাকে কোন মূল্য দিতে হয় না। কিন্তু

সমষ্টিগত ধন

সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই সকল জিনিস নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজ অর্থব্যয় করে এবং এই সকলের সরবরাহ সীমাবদ্ধ। সুতরাং এসমস্ত সমষ্টিগত ধন বলিয়া গণ্য।

জাতীয় ধন

কোন রাষ্ট্রাধীন সমস্ত ব্যক্তির ধনের সমষ্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত। জাতীয় ধনের পরিমাপ করিতে জাতির বৈদেশিক ঋণ বাদ দিতে হয়। ব্যক্তিগত ধন জাতীয় ধনের অংশ কিন্তু জাতীয় ধনে কোন ব্যক্তিগত স্বত্ব থাকে না। নদীসমূহ ব্যক্তিগত ধন নহে, কিন্তু জাতীয় ধন।

উপযোগ = অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বা গুণ

উপযোগ (Utility): অর্থবিদ্যায় উপযোগ বলিতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বুঝায়। মানুষের অভাব পরিতৃপ্ত করার গুণ বা ক্ষমতাই দ্রব্যের উপযোগ। উপযোগের সংগে কোন নীতির প্রশ্ন জড়িত নহে। কোন্ দ্রব্য উপকারী বা ক্ষতিকর, উপযোগ নির্ণয়ে সে প্রশ্ন বিবেচ্য নয়। দুগ্ধের যেমন সাধারণত অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং উপযোগ আছে, তেমনই মাতালের পক্ষে মদেরও অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং উপযোগ আছে। দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তাহার উপযোগ আছে।

উপযোগের তারতম্য

তবে কোন দ্রব্যের উপযোগের পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ও একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হইতে পারে। আহার্য হিসাবে ভাত বা রুটির উপযোগ সকলের কাছে সমান নয়। কাহারও নিকট ভাত অধিক উপযোগী এবং কাহার নিকট রুটি অধিক উপযোগী। আবার একই ব্যক্তির নিকট ক্ষুধার সময় ভাতের উপযোগ এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবার পর ভাতের উপযোগ বিভিন্ন।

উপযোগ পাঁচ প্রকারের

উপযোগ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে: (ক) প্রাকৃতিক উপযোগ (Natural Utility), (খ) রূপগত উপযোগ (Form Utility), (গ) স্থানগত উপযোগ (Place Utility) (ঘ) সময়গত উপযোগ (Time Utility) এবং (ঙ) সেবাগত উপযোগ (Service Utility)।

(ক) **প্রাকৃতিক উপযোগ** (Natural Utility): কতকগুলি প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের স্বাভাবিক উপযোগ আছে: যেমন, জল ও বাতাসের উপযোগ। ইহাদের উপযোগ প্রাকৃতিক উপযোগ।

(খ) **রূপগত উপযোগ** (Form Utility) : কোন দ্রব্যের রূপান্তর সাধন দ্বারা সেই দ্রব্যের উপযোগ বাড়ান যায়। একখণ্ড কাঠ অপেক্ষা সেই কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্রের উপযোগ বেশী। ছুতার-মিস্ত্রী কাঠের রূপান্তর-সাধনদ্বারা কাঠের উপযোগ বাড়াইয়া তোলে। নূতন রূপ দিয়া কোন দ্রব্যের যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহাকে রূপগত উপযোগ বলা হয়।

(গ) **স্থানগত উপযোগ** (Place Utility) : কোন বিশেষ স্থানে এক দ্রব্য সহজলভ্য হইলে সে দ্রব্য স্থানান্তরে (যেখানে সে দ্রব্য সহজলভ্য নয়) প্রেরণ করিলে সে দ্রব্যের উপযোগ অনেক বাড়িয়া যায়। রাণীগঞ্জে কয়লার যে উপযোগ, কলিকাতায় চালান দিলে সে উপযোগ অনেক বাড়িয়া যায়। কোন দ্রব্য স্থানান্তর করার ফলে যে উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি হয় তাহাই স্থানগত উপযোগ।

(ঘ) **সময়গত উপযোগ** (Time Utility) : সময়ের ব্যবধানে কোন দ্রব্যের যে উপযোগবৃদ্ধি হয় তাহাই সময়গত উপযোগ। কোন দ্রব্যের প্রাচুর্যের সময় সেই দ্রব্য আহরণ করিয়া দুষ্প্রাপ্যতার সময় সরবরাহ করিলে উহার সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন গ্রীষ্মকালের ফল আম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যদি শীতকালে সরবরাহ করা হয় তবে ঐ আমের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

(ঙ) **সেবাগত উপযোগ** (Service Utility) : কতগুলি অবাস্তব দ্রব্য মানুষের অভাব মিটায়। ইহাদের অভাব পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা বা উপযোগ সেবাগত উপযোগ। শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের সেবা প্রভৃতির উপযোগ সেবাগত।

অর্থবিদ্যায় **উৎপাদনের** (Production) **অর্থ উপযোগিতা বৃদ্ধি করা**। মানুষ কোন দ্রব্য উৎপন্ন করে না; দ্রব্যগুলি প্রকৃতিদত্ত। যখন আমরা বলি, "তূলা হইতে কাপড় উৎপন্ন হয়", "স্বর্ণকার গহনা প্রস্তুত করে" তখন আমরা ইহা বুঝি না যে তাঁতী তূলা বা স্বর্ণকার সোনা উৎপন্ন করিতেছে। আমরা ইহাই বুঝি যে তাঁতী এবং স্বর্ণকার তূলা ও সোনার রূপ বদলাইয়া তূলা ও সোনার উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে।

মূল্য (Value) : অর্থবিদ্যায় মূল্য কথার দুইটি অর্থ : **প্রয়োজন-মূল্য** (Value-in-use) এবং **বিনিময়-মূল্য** (Value-in-exchange)। সাধারণ

পরিবেশে জলের যে মূল্য অর্থাৎ অভাব পূরণের ক্ষমতা বা উপযোগ তাহা প্রয়োজন-মূল্য।

বিনিময়-মূল্য

একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই সেই দ্রব্যের বিনিময় মূল্য। এক মণ ধান দিয়া যদি ত্রিশ সের চাল পাওয়া যায় তাহা হইলে ত্রিশ সের চাল একমণ ধানের বিনিময়-মূল্য।

প্রয়োজন-মূল্য

অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' কথায় বিনিময়-মূল্যই বুঝায়। প্রয়োজন-মূল্য 'উপযোগ' কথাদ্বারা বুঝান হয়। এ কথা স্মরণীয় যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন-মূল্য বেশী হইলেই যে তাহার বিনিময়-মূল্য বেশী হইবে এমন নহে। জলের প্রয়োজন-মূল্য যথেষ্ট কিন্তু প্রাচুর্য হেতু বিনিময়-মূল্য, সাধারণ অবস্থায়, নাই বলা চলে।

দাম

আধুনিক জীবনে অর্থ দিয়া দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয়। **একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যত অর্থ পাওয়া যায় তাহাই ঐ দ্রব্যের দাম** (Price)। পঁচিশ টাকায় এক মণ চাল পাওয়া গেলে বলা হইবে যে এক মণ চালের দাম পঁচিশ টাকা।

ধন = মূল্যযুক্ত দ্রব্য

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে কোন দ্রব্যের মূল্য থাকিতে হইলে তাহার উপযোগ থাকিবে, তাহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ হইবে এবং দ্রব্যটি হস্তান্তরযোগ্য হইবে। কারণ, উপযোগ না থাকিলে কেহ সে দ্রব্য পাইতে চাহিবে না, সে দ্রব্য অনায়াসলভ্য হইলে কেহ তাহাব জন্য মূল্য দিবে না এবং একজনের নিকট হইতে অপরের পক্ষে সে জিনিস লওয়া বা পাওয়া সম্ভব না হইলে সে জিনিসের জন্য কোন মূল্য দেওয়া নিরর্থক হইবে। সুতরাং, যে দ্রব্যের মূল্য আছে তাহাকে ধন বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা কর এবং অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। (Discuss the subject-matter of Economics and define Economics) [পৃঃ ২-৪ দেখ।]

২। "মানুষের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের কাজগুলিই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু"—এই মত আলোচনা কর। ("Economics is the study of mankind in the ordinary business of life."—Discuss,) [পৃঃ ২-৪ দেখ।]

৩। অর্থবিদ্যার সূত্রের সহিত জড়বিদ্যাসমূহের সূত্রের পার্থক্য আলোচনা কর। (Discuss the difference between economic laws and the laws of the physical sciences.) [পৃঃ ৪-৫ দেখ।]

৪। (ক) ধনিকতন্ত্র, (খ) সমাজতন্ত্র ও (গ) মিশ্রতন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। (Write short notes on : (a) Capitalism, (b) Socialism, (c) Mixed economy.) [পৃঃ ৭-৮ দেখ।]

৫। ধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উদাহরণের সাহায্যে প্রদত্ত সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কর। (Define wealth. Illustrate your answer). [পৃঃ ৯-১০ দেখ।]

৬। উপযোগ বলিতে কি বুঝায় ? বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ ব্যাখ্যা কর। (What do you understand by Utility—? Discuss the different kinds of Utility.) [পৃঃ ১১-১২ দেখ।]

৭। মূল্য কি ? (ক) প্রয়োজন-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য, (খ) মূল্য ও দাম—ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর। (What is value ? Distinguish between (a) Value-in-use and value-in-exchange : (b) Value and price.) [পৃঃ ১২-১৩ দেখ।]

জাতীয় আয়
(National Income)

জাতীয় আয় কাহাকে বলে, কি তাহার গুরুত্ব, উহার সহিত জাতির জীবনযাত্রার মানের কি সম্পর্ক ইত্যাদি বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথমে অর্থবিদ্যায় 'আয়' বলিতে কি বুঝায় তাহাই আমাদিগকে জানিতে হইবে।

আয় (Income) : অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ ঠিক করা হয়। শ্রমের বিনিময়ে কোন ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে বা প্রতি বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহাই সে-ব্যক্তির সাপ্তাহিক বা মাসিক বা বাৎসরিক আয়। শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম বা অকর্মণ্য কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকলেই অসংখ্য প্রকার কাজে নিযুক্ত আছে। তাহারা তাহাদের কাজের বা উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ পায় তাহাই তাহাদের আয়।

ব্যক্তিগত আয়

কোন পরিবারে তিনজন আয় করিলে সেই তিনজনের আয়ের সমষ্টি সেই পরিবারের আয় (Family Income)।

পারিবারিক আয়

যে যেমন আয় করে সাধারণতঃ তাহার উপরে তাহার জীবনযাত্রা নির্ভর করে। যাহার আয় অল্প সে ভোগ্য বস্তু অল্প খরিদ্‌ করিতে পারে ও তাহার জীবনযাত্রার মান নীচু। যাহার আয় বেশী সে যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু খরিদ করিতে পারে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিলাস-দ্রব্যও খরিদ করিতে বা উদ্বৃত্ত টাকা সঞ্চয় করিতে পারে। ব্যক্তির মত জাতির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। যে জাতির আয় যত বেশী সে জাতির জীবনযাত্রার মান তত উঁচু।

আয় ও জীবনযাত্রার মান

সমস্ত কর্মক্ষম ভারতবাসী সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার সমষ্টিকে ভারতের জাতীয় আয় বলা হয়। ভারতের জাতীয় আয় কম। তাই, ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার মান নীচু।

[১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাব অনুযায়ী যেখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৯৩১২৲ ইংলণ্ডের ৬২৫২৲, সুইডেনের ৫২৭৫৲, এবং জাপানের ৯৫৩৲, ছিল, সেখানে **ভারতের গড়পড়তা বাৎসরিক আয়** ছিল মাত্র **২৯৪'৩ টাকা**।]

কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক ব্যক্তি যত অর্থ উপার্জন করে তাহাকে সাধারণ

কথায় তাহার সেই সময়ের আয় বলা হইলেও, সঠিক আয় নিরূপণের জন্য দুই একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

কোন ব্যক্তির আয় হিসাব করিতে হইলে, সে নগদ অর্থ ছাড়া বিনামূল্যে যে সব সুখসুবিধা ভোগ করে (ধরা যাক বিনা ভাড়ায় বাড়ী) সে সব সুখ-সুবিধার ন্যায্য অর্থমূল্যও তাহার নগদ পাওনার সংগে যোগ করিতে হইবে।

আয় = নগদ আয় + সুখসুবিধার অর্থমূল্য

মনে করা যাক, একজন রেলওয়ে কর্মচারী ১৫০৲ মাসিক বেতন পান এবং বিনা ভাড়ায় বাড়ী পান। তাঁহার বাড়ীর ন্যায্য ভাড়া ২০৲ হইলে তাঁহার আয় ১৫০৲+২০৲=১৭০৲ ধরা হইবে।

নীট আয়

আবার, আয় করিতে যদি কোন ব্যক্তির কিছু খরচ করিতে হয় (যেমন ঘরভাড়া, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি) তবে সে ব্যক্তির মোট আয় হইতে তাহার খরচ বাদ দিয়া তাহার **নীট আয়** (Nett Income) জানা যায়।

প্রকৃত আয়

অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ ঠিক করা হইলেও প্রকৃত আয় (Real Income) অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃত আয় নির্ভর করে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু কেনা যায় তাহার উপর।

ভারতে ১৯৪০ সালে জিনিসপত্রের দাম যাহা ছিল তাহা হইতে এখন যদি পাঁচগুণ বাড়িয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তির আয় ১৯৪০ সালে যাহা ছিল এখন তাহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে টাকার দিক হইতে তাহার আয় দ্বিগুণ হইলেও সে ব্যক্তি আগের চেয়ে কম ভোগ্যবস্তু খরিদ করিতে পারিতেছে বলিয়া তাহার প্রকৃত আয় বাড়ে নাই বরং কমিয়াছে।

আয় কাহাকে বলে জানিবার পর এবার আমরা জাতীয় আয় লইয়া আলোচনা করিব।

জাতীয় আয় (National Income): দেশের কতক লোক কৃষি, শিল্প, খনি, ব্যবসায়, পরিবহন ইত্যাদি নানা উপায়ে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে,

মোট জাতীয় আয় = মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্য

আবার শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতি সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করে—এই উভয়ের সমষ্টি মোট জাতীয় উৎপাদন বা Gross National Product (সংক্ষেপে GNP)। **মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়।**

মোট জাতীয় উৎপাদনের বা আয়ের হিসাব করিবার সময় বিশেষভাবে দেখিতে হয় যে কোন দ্রব্য বা দ্রব্যের মূল্য যেন দুইবার গণনা করা না হয়। একখানা মোটর গাড়ীর মূল্য নির্ধারিত করিতে হইলে ঐ গাড়ীটির জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় পৃথক ভাবে সে সকল উপকরণের মূল্য গণনা করিতে হয় না।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব

আধুনিক কালে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। জাতীয় আয় বিশ্লেষণের ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফল নির্ণয় করা যায় ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা করা যায়। জাতীয় আয় বিশ্লেষণে বণ্টন ব্যবস্থার গুণাগুণও বোঝা যায়।

নীট জাতীয় উৎপাদন (Nett National Product, সংক্ষেপে NNP) এবং **নীট জাতীয় আয়ঃ** কোন কৃষকের বা কোন কারখানার বাৎসরিক নীট আয় জানিতে গেলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়টি লক্ষ্য করিতে হইবে। দেখা যায় চাষী এক বৎসরে যত ধান ফলায় তাহা হইতে পরের বৎসর লাগাইবার জন্য কিছু বীজধান তুলিয়া রাখে। তেমনি আবার কোন কারখানায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে উহার কিছু কিছু ক্ষয় হইতে থাকে। সুতরাং প্রতিবৎসর যন্ত্রে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য হইতে, যন্ত্রের মেরামতের জন্য বা পুরাতন যন্ত্র বদলাইয়া নূতন যন্ত্র কেনার জন্য, কিছু টাকা তুলিয়া রাখিতে হয়। ঐ কৃষকের এবং ঐ কারখানার কোন বৎসরের নীট আয় জানিতে হইলে কৃষকের মোট আয় হইতে পরবর্তী বৎসরের জন্য সংরক্ষিত বীজধানের মূল্য এবং কারখানার মোট আয় হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের বা পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার সম্ভাব্য খরচ বাবদ তুলিয়া রাখা টাকা বাদ দিতে হইবে।

নীট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে গেলেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) হইতে ক্ষয়-ক্ষতি (depreciation) বাবদ ন্যায্য অর্থমূল্য বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP)।

মোট জাতীয় আয় হইতে কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Measures of National Income) :

জাতীয় আয় পরিমাপের নিম্নলিখিত দুইটি পদ্ধতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **উৎপাদন পদ্ধতি** (The Output Method) : এই পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট বৎসরে কোন দেশে কৃষি, খনি, শিল্প প্রভৃতিতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং যে সকল বিভিন্নপ্রকার সেবামূলক কার্য সম্পাদিত হয় তাহাদের সমষ্টির অর্থমূল্যের (Gross National Product : GNP) পরিমাপ করা হয়।

জাতীয় আয়=দেশের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য+সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্য

এই পদ্ধতি অনুসারে অর্থমূল্য নির্ধারণের সময় সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার গণনা করা না হয়। এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ এবং বিদেশের নিকট প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধ বিয়োগ করিতে হয়। স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের খরচও বাদ দিতে হয়।

(২) **আয় পদ্ধতি** (The Incomes Received Method) : এই পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত সকল কর্মীর আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। জমির মালিক বা খনির মালিক যে খাজনা বা নূতন আবিষ্কারের লাভ পায়, শ্রমিকেরা যে মজুরী ও ভাতা পায়, পুঁজিপতিরা যে সুদ পায়, ব্যবস্থাপকেরা যে মুনাফা পায়—সমস্ত যোগ করিয়া জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়।

জাতীয় আয়=দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত সকল কর্মীর আয়ের সমষ্টি

এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে কাহারও যে আয় হয় তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কারণ, এরূপ হস্তান্তরে মালিকানা বদল হয় মাত্র, নূতন ধন উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুকের আয়, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা প্রভৃতি দ্বারা বিনা উৎপাদনে যে আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

পরিসংখ্যানের দোষত্রুটি নিবারণের জন্য কখনও কখনও দুইটি পদ্ধতি একই সংগে ব্যবহার করা হয়। ভারতের জাতীয় আয় এই দুইটি পদ্ধতির একত্র ব্যবহারের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সঠিক জাতীয় আয় নির্ধারণ বিষয়ে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ও জিনিসপত্রের দামের হ্রাসবৃদ্ধি বা মূল্যস্তরের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গড়পড়তা জাতীয় আয় (Per Capita Income) :

$$\frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} = \text{গড়পড়তা জাতীয় আয়}$$

সঠিক জাতীয় আয় নির্ধারণের পর মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা জাতীয় আয় জানা যায়। গড়পড়তা জাতীয় আয় সাধারণভাবে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে। তবে গড়পড়তা আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে জিনিসপত্রের দামও যদি বাড়ে তাহা হইলে দেশের লোকের প্রকৃত আয় বাড়ে না।

গড়পড়তা জাতীয় আয় দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার নির্দেশক

জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও গড়পড়তা আয়, জনসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু, একই হারে না বাড়িতে পারে। ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫০-৫১—১৯৫৫-৫৬) জাতীয় আয় শতকরা ১৭.২ ভাগ বাড়িয়াছে এবং একই সময়ে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৬.৬ ভাগ। ফলে গড়পড়তা জাতীয় আয় বাড়িয়াছে শতকরা ১০.৫ ভাগ।

জাতীয় আয়ের বণ্টন (Distribution of National Income) :

প্রায় সব দেশেই জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থায় অসাম্য দেখা যায়। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ আসে কতিপয় ধনী লোকের হাতে। তাহার অর্থ এই যে অধিকাংশ লোকের আয় গড়পড়তা জাতীয় আয়ের চেয়ে কম, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং জনসংখ্যার অতি অল্প অংশ ধনী।

বণ্টন-বৈষম্য

ভারতে জাতীয় আয়ের বণ্টন দৃষ্টিকটুভাবেই বিষম। জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৩$\frac{1}{3}$ ভাগই তাহাদের হাতে যাহারা জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ।

***জীবনযাত্রার মান* (Standard of Living) :**

জীবনযাত্রার মান বলিতে কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সেই সবই বুঝিতে হইবে। কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ

রাখিয়া ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত পোষাক ও বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমস্তের তারতম্যে দেশে দেশে, কালে কালে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন হয়।

জীবনযাত্রার মান কিসের উপর নির্ভর করে

সাধারণতঃ ব্যক্তি ও পরিবার জীবনযাত্রার মান পূর্বপুরুষের নিকট হইতে পায় এবং কালক্রমে উহা ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ ও অনুকরণ-প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন দেশের জীবনযাত্রা সেই দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। তাই, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দেশের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ান ও জাতীয় আয়ের যথাসম্ভব সমবণ্টন আবশ্যক।

জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদান (Determinants of National Income)

নিম্নলিখিত চারটি উপাদানের উপর জাতীয় আয়ের উৎপাদন নির্ভর করে।

(ক) **জনসংখ্যা :** মানুষ ছাড়া কোন উৎপাদনই সম্ভব নয়। মানুষের শ্রম উৎপাদনের মূল উপাদান। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগের ফলে মানুষের অভাব মোচনের উপযোগী দ্রব্যে পরিণত হয়। তাই কোন দেশের উৎপাদন সেই দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কর্মক্ষমতার সংগে দক্ষতাও আবশ্যক। তাই দেখা যায়, যে দেশে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা অধিক সে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বেশী।

(খ) **প্রাকৃতিক সম্পদ :** জমি, বন, খনি, নদী, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। যে দেশের জমি উর্বর, যে দেশে মূল্যবান বৃক্ষসমূহের বন আছে, কয়লা লোহা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির খনি আছে, সুজলা ও সুনাব্য নদী আছে এবং যে দেশের আবহাওয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল, সে দেশে, অনুরূপ প্রাকৃতিক সুযোগহীন দেশ অপেক্ষা, উৎপাদন ও জাতীয় আয় অনেক বেশী হয়।

(গ) **মূলধন** (Capital) **:** মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই উৎপাদনের জন্য নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং যন্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে তাহার উৎপাদন-ক্ষমতাও বাড়িয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বহুগুণ বাড়াইয়াছে। পূর্বে একজন চাষী পুরাতন ধরনের লাঙল ও একজোড়া বলদের সাহায্যে একদিনে যতখানি জমি চাষ করিতে পারিত এখন ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙলের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমি ভালভাবে একদিনে চাষ করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি মূলধন যে দেশে যত বেশী সে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ তত বেশী।

(ঘ) পরিচালন-ক্ষমতা : কর্মক্ষম ও কর্মদক্ষ জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন—এই তিন উপাদানকে যথাযথভাবে পরিচালনা করিয়া দেশে যথেষ্ট উৎপাদন করিতে পরিচালনদক্ষ এক শ্রেণীর লোক দরকার। যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে যেমন সৈন্য পরিচালনা করিতে, সৈন্যদলের মনোবল ও দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সুনিপুণ সেনাপতি প্রয়োজন তেমনই জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নিপুণ পরিচালক আবশ্যক। কারণ পরিচালকেরাই ব্যবসায়ের ঝুঁকি নেন ও নূতন নূতন উৎপাদনপন্থা আবিষ্কার করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শুধু কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারাই জাতীয় উৎপাদনের মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, কর্মীর কর্মদক্ষতাও অত্যাবশ্যক।

শ্রমিক ও পরিচালকের কর্মদক্ষতা ও বিশিষ্ট জ্ঞান আবশ্যক

(ভারতবর্ষে প্রচুর শ্রমিক আছে। কিন্তু শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যথেষ্ট নহে। তাই, বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের উৎপাদন পরিমাণ ও গুণগতভাবে নিম্নস্তরের।) শ্রমিকের মত পরিচালকের বিশিষ্ট জ্ঞান ও কর্মকুশলতাও উৎপাদনের মান উন্নয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production)

জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সাধারণ ধারণা লাভ করা সম্ভব। এই প্রসংগে একথা মনে রাখিতে হইবে যে অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদন' শব্দের অর্থ 'উপযোগ সৃষ্টি'।

দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়লা উৎপাদনের কথাই ধরা যাক। কয়লা উৎপাদন করিতে প্রথমে চাই কয়লার খনি। খনি হইতে কয়লা তুলিবার জন্য চাই শ্রমিক। শ্রমিকের চাই যন্ত্র। সর্বশেষে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য চাই পরিচালক।

অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান হইল চারটি : **জমি** (Land), **শ্রম** (Labour), **মূলধন** (Capital) ও **পরিচালনা** (Organisation)।

জমি : অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝায়। ভূমি, ভূমির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, সকলপ্রকার খনিজ সম্পদ, নদী, সমুদ্র, বনজ বৃক্ষ ইত্যাদি সবই অর্থবিদ্যায় জমি বলিয়া ধরা হয়।

শ্রম : অর্থবিদ্যায় শ্রম বলিতে আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মানুষের সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক শ্রম বুঝায়। কেবলমাত্র, উৎপাদন-ব্যবস্থা-পরিচালনের জন্য পরিচালকের কার্য শ্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

মূলধন : উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের সময় শ্রমিকের জীবনধারণের ও কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই মূলধন বলিয়া গণ্য।

পরিচালনা : কেবল জমি, শ্রম ও মূলধন থাকিলেই উৎপাদন সম্ভব হয় না। এই তিন উপাদানের যথাযথ সমন্বয় সাধন করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের যথাযথ নিয়োগের জন্য সুষ্ঠু ও সুদক্ষ পরিচালনা আবশ্যক। পরিচালক উদ্যোগী হইয়া কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে ও লাভ-লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আধুনিক জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রশ্নাবলী

১। জাতীয় আয় বলিতে কি বোঝায়? জাতীয় আয় কিভাবে পরিমাপ করা যায়? (What is meant by National Income? How can National Income be measured?) [পৃঃ ১৬-১৮ দেখ।]

২। জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদান কি কি? (What are the factors determining the national income of a country?) [পৃঃ ২০-২১ দেখ।]

৩। (ক) মোট জাতীয় উৎপাদন, (খ) নীট জাতীয় উৎপাদন, (গ) গড়পড়তা জাতীয় আয়, (ঘ) জীবনযাত্রার মান—এগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (Write short notes on : (a) Gross National Product, (b) Nett National Product, (c) Per Capita Income, and (d) Standard of living.) [পৃঃ ১৬, ১৭, ১৯, ২০ দেখ।]

৪। উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (What are the factors of production?) [পৃঃ ২১-২২ দেখ।]

জনসংখ্যা

(Population)

পূর্বের আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষ তাহার বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া নানা দ্রব্য উৎপাদন করে এবং যথেষ্ট উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট জনসংখ্যা অত্যাবশ্যক। ইহাও দেখান হইয়াছে যে কোন দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারে সমতা না থাকিলে গড়পড়তা জাতীয় আয়ের হার কমিয়া যায়। অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, বেকারি প্রভৃতি নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। এইরূপ নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসংখ্যা পরস্পরের সংগে জড়িত।

ম্যালথাস-এর জনসংখ্যা (Malthusian Theory of Population) ঃ

ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ **ম্যালথাস** (Malthus)-এর মতে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতি (Geometrical progression) অনুসারে (যেমন ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৩...এই হারে) বাড়ে এবং অন্যদিকে খাদ্যোৎপাদন পাটীগণিতিক প্রগতি (Arithmetical progression) অনুসারে (যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯,...এই হারে) বাড়ে। সুতরাং জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য সরবরাহ কম হইয়া পড়ে। ইহার ফলে কালক্রমে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দেয়, যুদ্ধবিগ্রহ বাধে এবং প্রকৃতি তাহার আপন উপায়ে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমাইয়া দেয়। মনে হয় যেন খাদ্যের সরবরাহ ও জনসংখ্যার অনুপাত রক্ষার জন্যই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসংখ্যা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সমস্যা সম্বন্ধে ম্যালথাস-এর মত ঃ (১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার জ্যামিতিক প্রগতি অনুযায়ী

(২) খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির হার পাটীগণিতিক প্রগতি অনুযায়ী

অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা জনসংখ্যাবৃদ্ধি-নিরোধ ম্যালথাস-এর মতে **প্রাকৃতিক নিরোধ** বা positive checks। ম্যালথাস-এর মতে, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা জনসাধারণেরও কর্তব্য এবং তাহারা অধিক বয়সে বিবাহ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ,

প্রাকৃতিক নিরোধ

ব্রহ্মচর্য-পালন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে। ম্যালথাস-এর মতে, এ সমস্ত হইল **প্রতিরোধ ব্যবস্থা** বা preventive checks।

প্রতিরোধ

সমালোচনা : কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের মতে, ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক উন্নতির সংগে সংগে খাদ্যোৎপাদনের বহুগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। ম্যালথাস শুধু খাদ্যোৎপাদনের সংগে তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্যাকে বিচার করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে কোন দেশে খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও বিবিধ শিল্পজাত ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব এবং সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যাভাব দূর করা যায়। ইংল্যাণ্ড বহুকাল ধরিয়া শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া সেই আয়ে অন্য দেশ হইতে খাদ্য কিনিয়া আনিয়া দেশের খাদ্যাভাব মিটাইতেছে।

ম্যালথাস-তত্ত্ব বিজ্ঞান সাহায্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা হিসাব করে নাই

এ ছাড়া লোকের জীবনধারণের মান উন্নত হওয়ার সংগে সংগে জন্মের হার সাধারণতঃ কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে জন্মের হার কমিয়া গিয়াছে। এমন কি কোথাও কোথাও জন্মের হার প্রয়োজন অপেক্ষা কম হইবার আশংকাও দেখা দিয়াছে। সুতরাং জ্যামিতিক প্রগতি অনুসারে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিবে—এ মতবাদ আজ আর স্বীকার্য নহে।

জীবনধারণের মান-উন্নয়ন জন্মহার-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় : ম্যালথাস-এর তত্ত্ব আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার খাদ্যশস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সংগে সংগে জাতীয় আয় যদি সমতালে বর্ধিত হয় তবে বর্ধিত আয় দ্বারা যেখানে খাদ্যদ্রব্য সুলভ সেখান হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া দেশের খাদ্য-সমস্যা মিটান যায়। তাই, কোন দেশের জনসংখ্যার সমস্যা আলোচনা করিবার সময় সেই দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সংগে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার তুলনীয়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জাতীয় আয় তুলনা করিয়া তিন প্রকার অবস্থা অনুমান করা যায়। (ক) প্রথম অবস্থায় জাতীয় আয় জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় গড়পড়তা আয় বাড়ে। এ অবস্থাকে **জনসংখ্যাল্পতা** বা under-population বলে। (খ)

জনসংখ্যাল্পতা

দ্বিতীয় অবস্থায় গড়পড়তা আয় বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। এ অবস্থার জনসংখ্যাই **কাম্য জনসংখ্যা** বা optimum population।

অপ্রিজতা কাম্য জনসংখ্যা

(গ) তৃতীয় অবস্থায় জাতীয়-আয়-বৃদ্ধির পরিমাণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয় ও গড়পড়তা আয় কমিতে থাকে। এই অবস্থাকে বলে **অতি-প্রজতা** (over-population)।

অনুন্নত দেশ ও জনসংখ্যা সমস্যা: (Under-developed Countries and Population Problem) ম্যালথাস-এর তত্ত্বের সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে আজও পৃথিবীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির তুলনায় বেশী হইতেছে। ফলে অনুন্নত দেশগুলিতে খাদ্যসমস্যা আজ গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা

এই খাদ্যাভাব মিটাইবার উপায় হইল মোট জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়ান। উৎপাদন ও আয় বাড়াইতে হইলে শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধি ও অধিক মূলধন বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। মূলধন আসে দেশবাসীর সঞ্চয় হইতে। কিন্তু অনুন্নত দরিদ্র দেশে সঞ্চয় দ্বারা মূলধন সৃষ্টি অসম্ভব। তাই, অনুন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করা অত্যাবশ্যক।

নানা কারণেই অনুন্নত দেশসমূহে জন্মের হার বেশী। তবে পূর্বে মৃত্যুর হারও বেশী থাকাতে কোনপ্রকারে খাদ্যোৎপাদনের সহিত জনসংখ্যার সমতা রক্ষিত হইত। এখন এই সমস্ত দেশেও উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে মৃত্যুহার কমিয়া গিয়াছে এবং সেজন্য খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বেশী হইয়াছে।

ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা: ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে, ১৯৪১ সাল হইতে দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১৩·৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশে বর্তমানে জন্মের হার বেশী কিন্তু মৃত্যুর হার কমিয়াছে। খাদ্যোৎপাদন বাড়িলেও, জনংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধি কম। তাই, কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমাইতে না পারিলে এখানে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিবে ও মৃত্যুহার বাড়িবে।

ভারত ও জনসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

অপর পক্ষে কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দেখা দেয় নাই। দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধি জনসংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুত হারে হইতেছে ও গড়পড়তা আয় বাড়িতেছে। দেশের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইতে ও জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিতে কোন আশংকার কারণ নাই। ভারতবর্ষের উন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহের মূলগত উদ্দেশ্য—প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের বৃদ্ধি সাধন ও দেশে সুষম ধনবণ্টনব্যবস্থা প্রবর্তন। তবে ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে এ সমস্যা নাই

প্রশ্নাবলী

১। ম্যালথাস-এর জনসংখ্যাতত্ত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the Malthusian theory of population)

[পৃঃ ২৩-২৪ দেখ।]

২। "জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির সংগে তুলনা না করিয়া মোট জাতীয় আয়ের সংগে তুলনীয়"— এ মত আলোচনা কর।

(Discuss—"The growth of population is to be compared not with that of food-supply, but with that of total national income.")

[পৃঃ ২৩-২৪ দেখ।]

৩। (ক) প্রাকৃতিক নিরোধ, (খ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা, (গ) জন-সংখ্যাল্পতা ও (ঘ) কাম্য জনসংখ্যা —এগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(Write notes on (a) positive checks, (b) preventive checks, (c) under-population and (d) optimum population.

পৃঃ ২৩, ২৪, ২৫ দেখ।]

উৎপাদনের উপাদান

(১) জমি (Land)

অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ যে দেশে যত বেশী সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনাও তত বেশী। কিন্তু জমির পরিমাণ প্রকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। জমির সহিত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের এ পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইলেও, জমি সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এক সূত্র বা নিয়ম আছে: ইহার নাম **উৎপাদন হ্রাসের সূত্র** (Law of Diminishing Returns)।

উৎপাদন হ্রাসের সূত্র (Law of Diminishing Returns) :

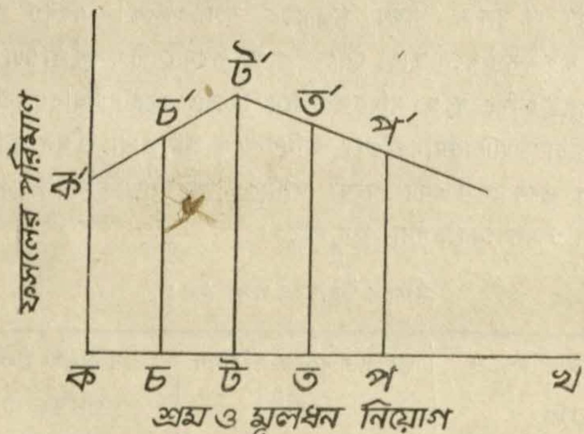
এই সূত্র অনুসারে, জমি চাষে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিতে থাকিলে একটা সময় আসিবে যখন সাধারণতঃ ফসল বৃদ্ধির পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির অনুপাতে কম হইবে।—একখণ্ড জমিতে সাধারণতঃ যত ফসল ফলে তাহা হইতে প্রথম প্রথম বেশী ফসল পাওয়া যাইবে যদি চাষী সেই জমির খণ্ডে অধিকতর শ্রম নিয়োগ করে বা আরও বেশী সার দেয়। কিন্তু চাষী যদি ক্রমাগত সেই জমির খণ্ডে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলে তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবে যখন বাড়তি ফসলের পরিমাণ বাড়তি শ্রম ও মূলধনের তুলনায় কম হইবে।

নীচের উদাহরণ লক্ষ্য কর:

বিঘাপ্রতি শ্রমিক ও মূলধন	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ মোট	অতিরিক্ত উৎপাদন বা প্রান্তিক চাষীর উৎপাদন
১ চাষী + ১ লাঙল	১৫ মণ	১৫ মণ
২ চাষী + ২ লাঙল	৩৫ মণ	২০ মণ
৩ চাষী + ৩ লাঙল	৪৫ মণ	১০ মণ
৪ চাষী + ৪ লাঙল	৫০ মণ	৫ মণ

উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে একজন চাষী একখানা লাঙল দিয়া চাষ করিয়া ১৫ মণ ধান ফলাইত। দুইজন চাষী দুইখানা লাঙল দিয়া চাষ করিয়া (অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন দ্বিগুণ করিয়া) দেখিল যে এবার জমির ফলন হইল ৩৫ মণ—অর্থাৎ দ্বিতীয় চাষী ও লাঙলের উৎপাদন ২০ মণ (১৫ মণ নহে)। কিন্তু তৃতীয় লোক ও তৃতীয় লাঙল কাজে লাগাইয়া মোট ফসল পাওয়া গেল ৪৫ মণ, অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ফসল বৃদ্ধি হইল মাত্র ১০ মণ। চতুর্থ চাষী ও লাঙল নিয়োগ করিবার ফলে পূর্বের তুলনায় ফসল বৃদ্ধি আরও কম হইল (মাত্র ৫ মণ)। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, একখণ্ড জমিতে যতই শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইবে ফসল বৃদ্ধির হার তুলনায় কমিতে থাকিবে।

নিম্নের রেখাচিত্রের ন্যায় রেখাচিত্রের সাহায্যেও এই সূত্রটি সহজেই বুঝা যায়। উহা হইতে দেখা যাইবে যে শ্রম ও মূলধন বাড়াইতে থাকিলে (কচ, চট), প্রাথমিক অবস্থা (কক´) হইতে প্রথম প্রথম অনেক বেশী ফসল (চচ´, টট´) পাওয়া যাইবে। কিন্তু শ্রম ও মূলধন আরও বাড়াইলে (টত, তপ), ফসল-বৃদ্ধির পরিমাণ অনুপাতে কমিতে থাকিবে (তত´, পপ´)।



অনুসিদ্ধান্ত: উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি

এ নিয়ম হইতে আর একটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে ক্রমেই বেশী ফসল উৎপন্ন করিতে উৎপাদনের ব্যয় প্রথম দিকে হয়তো কম হইলেও ক্রমে ব্যয় আনুপাতগতভাবে বাড়িয়া চলিবে। এক চাষী ও এক লাঙল দিয়া ১৫ মণ ফসল ফলাইতে যদি ৪৫৲ খরচ হয় তবে মণপ্রতি খরচ পড়িল ৩৲। দুই চাষী ও দুই লাঙলে ৩৫

মণ ফসল ফলাইতে যদি ৯০৲ খরচ হয় তবে মণ প্রতি খরচ পড়িল প্রায় ৩ টাকা ৬০ নয়া পয়সা। এইভাবে চার চাষী ও চার লাঙলে ৫০ মণ ফসল ফলাইতে ১৮০৲ খরচ হইলে মণপ্রতি খরচ পড়িবে ৩ টাকা ৬০ নয়া পয়সা।

ব্যতিক্রম : অবশ্য কোন উন্নত ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে এই ব্যয়-বৃদ্ধির প্রবণতা দূর হইতে পারে এবং উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম প্রতিরোধ করাও সম্ভব হইতে পারে। যেমন, কোন এক খণ্ড জমি আগে ভালভাবে চাষ করা না হইয়া থাকিলে সে জমি ভালভাবে চাষ করিলে বেশী ফসল পাওয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের ব্যতিক্রমের ঘটনা সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে এ ক্ষেত্রেও উৎপাদন হ্রাসের সূত্র কার্যকর হইবে।

উন্নত ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম প্রতিরোধ সম্ভব

শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের সূত্র : কোন বিশেষ জমিতে উৎপাদন বাড়াইবার সময় জমির পরিমাণ একই থাকে, কেবল উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান বাড়ান হয়। এইরূপ যে কোন উৎপাদন-ব্যবস্থায় একটি উপাদানের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ বাড়াইলে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। কিন্তু উৎপাদনের সবগুলি উপাদানের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হইলে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম খাটিবে না।

সেইভাবে শিল্পে যদি উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান না বাড়াইয়া অন্য এক বা একাধিক উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় তবে উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে। কেহ যদি যন্ত্রপাতি না বাড়াইয়া কেবল শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ায় তবে ক্রমে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম খাটিবে না।

(২) শ্রম : শ্রমিক

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শ্রম কথাটি দ্বারা অর্থবিদ্যায় আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমই বুঝায়। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে যাহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে তাহারা সকলেই শ্রমিক।

কোন দেশের মোট শ্রমিকসংখ্যা সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। শিশু ও বৃদ্ধেরা শ্রম করে না এবং কোন দেশেই স্ত্রীলোকদের সকলে শ্রম করে না। আমাদের দেশে তো স্ত্রীলোকদের অধিকাংশই শ্রমিক

নয়। সাধারণতঃ কোন দেশের শ্রমিক-জনসংখ্যা (working population) ঠিক করিতে হইলে ১৫ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক জনসমষ্টিকে ধরিতে হয় এবং এই সংখ্যা হইতে শ্রম করে না এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাদ দিতে হয়।

শ্রমিকসংখ্যা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল

শ্রমিক-সংখ্যার সঠিক পরিমাপে শ্রমিকের দক্ষতাও বিচার্য। একজন দক্ষ শ্রমিক একজন অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিতে পারে। কোন দেশে যদি শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তবে সে দেশে শ্রমিকের সংখ্যা একই থাকিলেও শ্রমিক সরবরাহ বাড়িয়াছে বলা চলে।

শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Labour): শ্রমিকের দক্ষতা প্রধানতঃ নির্ভর করে শ্রমিকের (১) কাজ করিবার ক্ষমতা ও (২) কাজ করিবার ইচ্ছার উপর।

(ক) শ্রমিকের কাজ করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার স্বাস্থ্যের উপর এবং তাহার স্বাস্থ্য স্বভাবতঃই পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস ও দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গরম দেশের আবহাওয়ায় একজন শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম করিতে পারে শীতের দেশের আবহাওয়ায় একজন শ্রমিক তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রম করিতে পারে।

স্বাস্থ্য

(খ) সাধারণ ও যান্ত্রিক শিক্ষা শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ায়। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে এবং যান্ত্রিক শিক্ষা তাহার নিপুণতা বৃদ্ধি করে।

শিক্ষা

(গ) দক্ষতার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সহিত শ্রমিকের কর্মপ্রবৃত্তি (কাজ করিবার ইচ্ছা) থাকাও একান্ত আবশ্যক। কর্মে উন্নতির আশা ও কর্মস্থলে আশাজনক পরিবেশ শ্রমিকের কর্মপ্রবৃত্তি জাগায় ও কর্মপ্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।

দক্ষতা উত্তম পরিচালনার (উপযুক্ত লোককে ঠিক কাজে লাগান, কর্মীকে উৎসাহদান, ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মাল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ প্রভৃতি) উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে এবং সুষ্ঠু পরিচালনা শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াইতে পারে।

পরিচালনা

ভারতের শ্রমিকের দক্ষতার অভাব সুবিদিত। এখানে শ্রমিক অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন এবং তাহার কর্মস্থলের পরিবেশ শোচনীয়। দেশের আবহাওয়া

শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধির প্রতিকূল। ভারতীয় শ্রমিককে দেশের স্বার্থে দক্ষ করিয়া তোলা দরকার। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা, সাধারণ শিক্ষা ও যান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার, কারখানার অবস্থার উন্নতিসাধন অত্যাবশ্যক এবং আধুনিক পরিচালন-ব্যবস্থার প্রচলনও প্রয়োজন।

(৩) মূলধন

এক ব্যক্তি যে টাকা-কড়ি তাহার ব্যবসায়ে খাটায় সাধারণ কথাবার্তায় তাহাকেই তাহার মূলধন বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় টাকা-কড়ি মূলধন নহে টাকা-কড়ির বিনিময়ে নানা দ্রব্য কেনা যায় মাত্র। মূলধন বলিতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

মূলধনের সংজ্ঞা

কতকগুলি দ্রব্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভাব মেটায়। সেইগুলি আমরা ভোগ ও ব্যবহার করি। এই সকল দ্রব্যকে আমরা **ভোগ্য দ্রব্য** (consumption goods) বলি। তেমনি আবার কতকগুলি দ্রব্য আমরা উৎপাদনে ব্যবহার করি—অর্থাৎ সেইগুলির সাহায্যে আমরা অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করি। যে সকল দ্রব্যের সাহায্যে অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করা হয় অর্থবিদ্যায় সেইগুলিকে মূলধন (Capital) বলে ; যেমন, কারখানার ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিকদের আহার্য পোষাক ইত্যাদি।

জমি মূলধন নহে

'জমি' কি মূলধন : উপরে প্রদত্ত মূলধনের সংজ্ঞা অনুসারে জমি মূলধন। কিন্তু কেহ কেহ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, মানুষের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যকেই মূলধন বলা উচিত। প্রকৃতিদত্ত বলিয়া জমি মূলধন নয়। তাঁহাদের মতে, উৎপাদনকার্যে প্রয়োগযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যই মূলধন।

ধন ও মূলধন (Wealth and Capital) : পূর্বের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছ ভোগ্যবস্তু ধন, কিন্তু মূলধন নহে। ধনের যে অংশ ধনের পুনরুৎপাদনে নিয়োগ করা হয় তাহাই মূলধন। অতএব, কোন ধন মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে কিনা তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত কয়লা মূলধন নহে, কিন্তু কারখানার চুল্লীতে ব্যবহৃত কয়লা মূলধন। জমি ধন কিন্তু প্রকৃতিদত্ত বলিয়া মূলধন নহে।

বিভিন্ন প্রকারের মূলধন (Different kinds of Capital)

স্থায়ী এবং চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) : যে দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বারবার উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহাকে **স্থায়ী মূলধন** (Fixed Capital) বলা হয় : যেমন, যন্ত্রপাতি, কারখানার বাড়ীঘর প্রভৃতি।

স্থায়ী মূলধন

যে দ্রব্য উৎপাদন কার্যে একবার ব্যবহারের ফলেই নূতন রূপ নেয় তাহাকে **চলতি মূলধন** (Circulating Capital) বলা হয় : যেমন কাঁচামাল, বীজ, সার প্রভৃতি।

চলতি মূলধন

বিশিষ্ট ও নির্বিশিষ্ট মূলধন (Specialised or Sunk and Unspecialised or Floating Capital) : যে সকল যন্ত্রপাতি কেবলমাত্র এক বিশিষ্ট শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সকল যন্ত্রপাতি **বিশিষ্ট মূলধন** (Specialised or Sunk Capital) ; যেমন, রেলওয়ে ইঞ্জিন। যাহা একাধিক শিল্পে উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা যায় তাহা **নির্বিশিষ্ট মূলধন** (Unspecialised or Floating Capital) : যেমন, কয়লা।

বিশিষ্ট মূলধন

নির্বিশিষ্ট মূলধন

সহায়ক ও ভোগ্য মূলধন (Auxiliary and Consumer's Capital) : যন্ত্রপাতি, রেল, জাহাজ, কারখানা ইত্যাদি উৎপাদনের কার্যে সহায়তা করে বলিয়া এইগুলিকে **সহায়ক মূলধন** (Auxiliary Capital) বলা হয়। কোন ভোগ্য বস্তু (যে সব বস্তু সরাসরি মানুষের অভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারে) উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে **ভোগ্য মূলধন** (Consumer's Capital) বলে : যেমন, শ্রমিকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি।

সহায়ক মূলধন

ভোগ্য মূলধন

কি কি বিষয়ের উপর মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে (Factors govening accumulation of Capital) :

কোন দেশের মূলধনবৃদ্ধি সেই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণ তাহাদের মানসিক অবস্থা ও বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জনসাধারণের **সঞ্চয়ের ইচ্ছা** (মানসিক) থাকা চাই এবং কার্যতঃ তাহাদের **সঞ্চয়ের ক্ষমতা** (বাহ্যিক) থাকা চাই।

কিন্তু সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় করা বা মূলধন বৃদ্ধি করা যায় না। সঞ্চয়ের ক্ষমতা অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা অধিক আয়ও অত্যাবশ্যক। যেখানে উদ্বৃত্ত নাই সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। ভারতবাসীর সঞ্চয়-ইচ্ছা কাহারো অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর আয় এত কম যাহাতে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিই মেটে না। তাই, সঞ্চয়-ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয়-ক্ষমতার অভাবে ভারতবাসীর সঞ্চয় নাই এবং ভারতবর্ষে মূলধনের এত অভাব।

উদ্বৃত্ত না থাকিলে সঞ্চয় অসম্ভব

দেশে সুশাসন (চোর-ডাকাতের উৎপাত না থাকা) ও সঞ্চয়ের সুবিধা (ব্যাংক, বীমাকোম্পানী, অংশীদারী কারবার প্রভৃতির সুযোগ) দেশবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহী এবং দেশের মূলধনবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

দেশে সুশাসন ও সঞ্চয়ের সুবিধা থাকা প্রয়োজন

দেশে প্রচলিত ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ইত্যাদিও সঞ্চয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মমত অনুসারে সঞ্চয় গর্হিত কর্ম। আবার, সামাজিক প্রথা অনুসারে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে (বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) অনেকে সাধ্যাতীত ব্যয় করে; তাহাতে সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যায়, বহু ক্ষেত্রে ঋণও করিতে হয়।

ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ইত্যাদির প্রভাব

সঞ্চয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বিধান, পোষ্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা, সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাহার মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে।

সঞ্চয়-ইচ্ছা স্বাভাবিক

প্রশ্নাবলী

১। উৎপাদন হ্রাসের সূত্র ব্যাখ্যা কর। ইহা কি কৃষি-উৎপাদন ও শিল্পোৎপাদনে একই ভাবে প্রযোজ্য? (Explain the Law of Diminishing Returns. Is it equally applicable in agriculture and industry?) [পৃঃ ২৭-২৯ দেখ]

২। শ্রমিকদের দক্ষতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (What are the causes of efficiency of labour?) [পৃঃ ৩০-৩১ দেখ]

৩। মূলধন কাহাকে বলে? (ক) ধন ও মূলধন এবং (খ) স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখাও। (What is Capital? Distinguish between (a) wealth and capital, (b) fixed and circulating capital.) [পৃঃ ৩১-৩২ দেখ]

৪। কি কি বিষয়ের উপর মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে? (What are the factors governing accumulation of capital?) [পৃঃ ৩২-৩৩ দেখ]

বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান

(Forms of Business Organisation)

সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ধরণের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইল একমালিকী ব্যবসায়।

একমালিকী ব্যবসায় (Single-owner Firm) : একমালিকী ব্যবসায়ে একজন মাত্র মালিক থাকে। সে-ই ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের সমস্ত ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করে। আমাদের দেশে কৃষিকার্য ও খুচরা বিক্রয়ে এইরকম ব্যবসায় দেখা যায়।

সুবিধা

এই ধরণের ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের সমস্ত দায়িত্ব একা মালিকের উপর থাকে বলিয়া মালিক সতর্কতার সংগে ব্যবসায় চালায়, নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে ও দেখিয়া শুনিয়া কর্মচারী নিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন ও পরিচালনার ব্যয় তাহার খুব কম পড়ে। তাছাড়া এ জাতীয় ব্যবসায় খুব সহজে আরম্ভ করা যায় ও গুটান যায়।

অসুবিধা

কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়ে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক সে পরিমাণ মূলধন একজনের প্রায়ই থাকে না এবং থাকিলেও একজনের পক্ষে ব্যবসায়ে সে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ যুক্তিযুক্তও নয়। কারণ, তাহার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; এবং সেক্ষেত্রে তাহার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনাও থাকে।

একমালিকী ব্যবসায়ের এই অসুবিধা দূর করিতেই অংশীদারী ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়।

অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership Business) : অংশীদারী ব্যবসায়ে মালিকানা থাকে অংশীদারদের হাতে এবং লাভ-লোকসানের ঝুঁকিও তাহাদেরই। এ জাতীয় ব্যবসায়ে মূলধন যোগাড় করা একমালিকী ব্যবসায়ের তুলনায় সহজ। অংশীদারদের যথেষ্ট যোগ্যতা থাকিলে এ জাতীয় ব্যবসায়ও যথেষ্ট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা যাইতে পারে।

সুবিধা

কিন্তু এই ব্যবসায়ের এক বিশেষ ত্রুটি এই যে এক অংশীদারের ভুল বা অযোগ্যতার জন্য ব্যবসায়ের ও অন্যান্য সকল অংশীদারের লোকসান হইতে পারে। তাছাড়া এ জাতীয় কারবারে অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ নহে (unlimited liability)। প্রত্যেকেই কারবারের লাভ-লোকসানের জন্য সমভাবে দায়ী। দায় সীমাবদ্ধ না থাকায়, কারবারে যদি খুব দেনা হইয়া পড়ে তাহা হইলে মহাজন দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদারেরই সর্বস্ব ক্রোক করিতে পারে। আবার, এ ব্যবসায়ে একজন অংশীদার দেউলিয়া বা উন্মাদ হইলে ব্যবসায় ভাঙিয়া যায়।

অসুবিধা

এ জাতীয় ব্যবসায়ের এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য এক ভিন্ন ধরণের অংশীদারী ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ (limited liability) থাকে। ইহাকে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বলে।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় (Joint Stock Company) : এ জাতীয় ব্যবসায়ে জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন মূল্যের শেয়ার বিক্রয়দ্বারা মূলধন সংগৃহীত হয়। এই ধরণের ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়ের ঋণের জন্য পাওনাদারের নিকট তাহাদের দায় তাহাদের প্রত্যেকের 'শেয়ার'-এর মূল্যদ্বারা সীমাবদ্ধ। একজন যত টাকার 'শেয়ার' কিনিয়াছে কারবার ফেল পড়িলে মাত্র তত টাকাই তাহার লোকসান হইতে পারে, তাহার বাকী সম্পত্তি মহাজন ক্রোক করিতে পারে না।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে অংশীদারেরা তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন পরিচালক (Director) নির্বাচিত করে এবং নির্বাচিত পরিচালক-মণ্ডলী (Board of Directors) ব্যবসায় পরিচালনা করে ও লাভ লোকসানের হিসাব করে। বৎসরের শেষে যাহা লাভ হইবে তাহা লভ্যাংশ (dividend) রূপে অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। লোকসানের অংশও অংশীদাররাই বহন করে।

গঠন

অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের অংশ বা 'শেয়ার' মোটামুটি দুই প্রকারের—সাধারণ (Ordinary) ও অগ্রগণ্য (Preferential)। সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশের কোন নির্দিষ্ট হার থাকে না, যে বৎসর যেরূপ লাভ হয় তদনুসারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। কিন্তু অগ্রগণ্য 'শেয়ার'-এর মালিকদের লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে। তাহাদের

সাধারণ শেয়ার

লভ্যাংশ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অবশ্য কোন বৎসরে কোন লাভ না হইলে অগ্রগণ্য 'শেয়ার'-এর মালিকও সে বৎসর কিছু পায় না। তবে তাহার 'শেয়ার' যদি সঞ্চয়মূলক (cumulative) হয় তাহা হইলে পরে যে বৎসর লাভ হইবে সে বৎসর তাহাকে পূর্ববর্তী সমস্ত বৎসরের লভ্যাংশ দিতে হয়।

অগ্রগণ্য শেয়ার

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে 'শেয়ার' বিক্রয় ছাড়া ঋণপত্র বা বণ্ড (bond) ও ডিবেঞ্চার (debenture) বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যাহারা ঋণপত্র বা 'ডিবেঞ্চার' কেনে, তাহারা কোম্পানীর মহাজন হিসাবে গণ্য হয় এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। কোম্পানীর লাভ না হইলেও ডিবেঞ্চার-ক্রেতাদের সুদ দিতে হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে ঋণ শোধ করিতে হয়।

ডিবেঞ্চার

কোম্পানী যদি ফেল পড়ে তবে কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রথমে ঋণপত্রের ঋণ শোধ করা হয়। তারপরে অগ্রগণ্য 'শেয়ার'-এর মূল্য যথাসম্ভব দেওয়া হয় এবং সর্বশেষে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা হইতে সাধারণ অংশীদারদের 'শেয়ার'-এর টাকা যথাসম্ভব দেওয়া হয়।

সুবিধা—যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের প্রধান সুবিধা এই যে এ ব্যবস্থায় অতি সহজে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব এবং দায় সীমাবদ্ধ হওয়াতে অনেকেই 'শেয়ার' খরিদ করিতে উৎসাহী হয়। মূলধন অধিক থাকাতে এ জাতীয় ব্যবসায়ে বৃহদায়তনে উৎপাদন, বেশী পারিশ্রমিক দিয়া উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ব্যয়বহুল প্রচার-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি সম্ভব হয়।

ত্রুটি—যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ত্রুটি হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পরিচালক-মণ্ডলীর ত্রুটি বা অসাধুতার জন্য বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং বেতনভুক্ কর্মচারীদের উৎসাহ ও নিষ্ঠার অভাবে পরিচালন দোষযুক্ত হইতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে অসুবিধা অপেক্ষা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে সুবিধা অনেক বেশী। আধুনিক বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানের পত্তন ও পরিচালনা যৌথ মূলধন ছাড়া সম্ভব নয়।

অসুবিধা

রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যবসায় (State-managed Business)—উপরে যে-সব

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে তাহা সবই বে-সরকারী মালিকানার অধীন। কিন্তু আজকাল বহু রাষ্ট্রেই—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তো কথাই নাই, সেখানে সব ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রায়ত্ত—সরকারী মালিকানা ও পরিচালনার অধীন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে। এ জাতীয় ব্যবসায় সরকার হয় নিজেই প্রতিষ্ঠা করে অথবা পূর্ববর্তী মালিকদের নিকট হইতে কিনিয়া নেয় এবং ইহার মূলধন সরকারী তহবিল বা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। এ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি দেশের জনসাধারণই বহন করে। ভারতীয় রেলওয়েগুলি এই ধরণের রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যবসায় কাহাকে বলে

এ জাতীয় ব্যবসায়ের সাফল্য বা অসাফল্য সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও সাধুতার উপর নির্ভর করে।

সমবায় (Co-operation)—আর এক ধরণের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহার মূল ভিত্তি হইল 'সমবায়' বা সংঘবদ্ধতা। সমবায়ের মূলনীতি 'একতাই বল'। কিছুসংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় একত্র হইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দরিদ্র বা দুর্বল হইলেও সংঘবদ্ধ ভাবে তাহারা নানা সুখ-সুবিধার অধিকারী হয়। অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা ছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের নৈতিক উন্নতি লাভ সম্ভব হয়।

সমবায়ের মূল নীতি

সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যাপারে ধনী পুঁজিপতিদের কোন স্থান নাই। শ্রমিকরা পরস্পরের সহযোগিতায় নিজেরাই উৎপাদন করে ও লাভ তাহারাই ভোগ করে। মূলধন প্রত্যেকে আংশিক দেয় ও প্রয়োজনবোধে সমিতির পক্ষ হইতে ঋণ করা হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রেও ক্রেতা ও ভোগকারী ব্যক্তিরা সমবেতভাবে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারে এবং এ জাতীয় ব্যবসায়ে ভোগকারী ক্রেতাও মালিক হয়। এভাবে সমবায় প্রথা উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের সুবিধা সৃষ্টি করে।

সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য

সমবায়ের মূলনীতি : (ক) ঘনিষ্ঠতা (Proximity)—সমিতির সভ্যগণ সকলে সকলকে চিনিবে এবং একই অঞ্চল বা বৃত্তির লোক হইবে। (খ) সাম্য (Equality)—যাহার যত শেয়ারই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সভ্য সমিতি

গঠনে এক ভোটের অধিকারী। (গ) স্বেচ্ছা-গঠিত সমিতি (Voluntary Association)—প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় সমিতিতে যোগদান করে। (ঘ) সততা (Honesty)—যাহারা অসাধু বা অসৎ তেমন কোন ব্যক্তিকে সভ্য করা হয় না। (ঙ) মিতব্যয়িতা (Economy)—দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সুবিধার জন্য সমবায় সমিতিতে মিলিত হয়। সুতরাং পরিচালন-ব্যবস্থায় যথাসম্ভব মিতব্যয়িতা সমবায়ের লক্ষ্য। (চ) সমষ্টিবোধ (Solidarity)—সমবায় সমিতিতে একই অবস্থার ব্যক্তিগণ পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতির জন্য মিলিত হয় বলিয়া সহজেই সভ্যগণের মধ্যে সমষ্টিবোধ জাগে এবং এ বোধ সমবায়ের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

সমবায়ের মূলনীতি :
(১) ঘনিষ্ঠতা,
(২) সাম্য,
(৩) স্বেচ্ছা-গঠন,
(৪) সততা,
(৫) মিতব্যয়িতা,
(৬) সমষ্টিবোধ

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি : বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। সমিতির সভ্যগণের শ্রেণীগত নাম বা সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে সমিতির নামকরণ হয়। যেমন, কয়েকজন উৎপাদক প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া উৎপাদনের সুবিধার জন্য যদি এক সমবায় সমিতিতে মিলিত হয় তখন সে সমিতিকে উৎপাদক সমিতি (Producers' Co-operation) বলা হয়। ক্রেতারা ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের সুবিধার জন্য এক সমিতি গঠন করিলে সে সমিতিকে ভোগকারী সমিতি (Consumers' Co-operation) বলা হয়। কোন সমিতি শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত (Urban) বা গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত (Rural) হইতে পারে। কৃষক শ্রেণীর সমিতিকে কৃষি সমবায় সমিতি (Agricultural Co-operative Society), ঋণ পাইবার জন্য গঠিত সমিতিকে সমবায় ঋণ সমিতি (Co-operative Credit Society), ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতিকে সমবায় ক্রয় সমিতি (Co-operative Purchase Society), বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতিকে সমবায় বিক্রয় সমিতি (Co-operative Sale Society) বলা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইলে তাহাকে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি (Multipurpose Co-operative Society) বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের সমিতি :
(১) উৎপাদক সমিতি
(২) ভোগকারী সমিতি
(৩) শহরাঞ্চলের সমিতি
(৪) গ্রামাঞ্চলের সমিতি
(৫) কৃষি সমবায় সমিতি
(৬) সমবায় ঋণ সমিতি
(৭) সমবায় ক্রয় সমিতি
(৮) বিক্রয় সমিতি
(৯) সর্বার্থসাধক সমিতি

প্রাথমিক (Primary) সমিতিগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদের

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Co-operative Society) থাকে। কেন্দ্রীয় সমিতি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে উপদেশ, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করে।

ভারতীয় সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) —প্রথম সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতে কৃষি-ঋণদান সমিতি গঠিত হয় ১৯০৪ সালে। ক্রমে সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং ১৯১২ সালে এক আইনদ্বারা বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। বর্তমানে ভারতে বহুপ্রকার সমিতি গঠিত হইয়াছে। কৃষকদের বীজ ও সার দেওয়া, ঋণদান, সেচব্যবস্থা, জমি একত্রীকরণ, কৃষি ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমিতিগুলি সাহায্য করে।

গোড়াপত্তন

জনসাধারণের অশিক্ষা ও সমবায়ের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ভারতবর্ষে সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনায় অনেক ত্রুটি বাসা বাঁধিয়াছে। তাছাড়া এখানে সমবায় আন্দোলন সরকারী সৃষ্টি বলিয়া ও সরকারের দীর্ঘকালব্যাপী নিয়ন্ত্রণের ফলে এ আন্দোলন এখনও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নয়। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনে ঋণদান সমিতিগুলির ভূমিকাই প্রধান।

দোষ-ত্রুটি

গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতির গঠন ও কাজ (Organisation and functions of a Rural Co-operative Credit Society)—কোন একটি গ্রাম বা সন্নিহিত একাধিক গ্রামের অধিবাসীদের ভিতর হইতে দশ জন সাবালক ব্যক্তি লইয়া একটি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সদস্যগণ পরস্পরের পরিচিত হওয়া চাই। সমিতির সদস্য হইবার জন্য প্রত্যেককে এক টাকা প্রবেশ ফী দিতে হয় ও সমিতির শেয়ার কিনিতে হয়। প্রবেশ ফী, শেয়ার বিক্রয়ের টাকা ও সদস্যগণের আমানত লইয়া সমিতির মূলধন গঠিত হয়। কেবলমাত্র সদস্যগণই সুবিধাজনক শর্তে সমিতির নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারে। ঋণ গ্রহণকারীকে সদস্যদের মধ্য হইতেই জামিন রাখিতে হয়। সমিতির ঋণের জন্য কোন পাওনাদার সমিতির যে কোন সদস্যের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে।

গঠন ও কার্যাবলী

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে কার্য পরিচালনার জন্য একজন সম্পাদক

(Secretary) ও একজন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) এবং এক পরিচালক-মণ্ডলী নির্বাচিত করে। যথেষ্ট মিতব্যয়িতার সহিত গণতান্ত্রিক নীতিতে সমিতি পরিচালিত হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ব্যাঙ্ক আছে।

পরিচালন

প্রশ্নাবলী

১। অংশীদারী ও যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের পার্থক্য বুঝাও। (Distinguish between a Partnership and a Joint-Stock Company.) [পৃঃ ৩৪-৩৫ দেখ]

২। যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে কি কি উপায়ে মূলধন সংগৃহীত হয়? যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গুণাগুণ বর্ণনা কর। (What are the ways in which a joint-stock company raises its capital ? Describe the advantages and disadvantages of a joint-stock company.) [পৃঃ ৩৫-৩৬ দেখ]

৩। সমবায় বলিতে কী বোঝ? সমবায়ের মূলনীতি কী কী? সমবায় কী কী ভাবে কৃষককে সাহায্য করিতে পারে? (What do you mean by co-operation ? What are its basic principles ? How can it help an agriculturist ?) [পৃঃ৩৭-৩৮ দেখ]

৪। গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতির গঠন ও কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (Describe the organisation and functions of a rural co-operative credit society.) [পৃঃ ৩৯-৪০ দেখ]

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পসংস্থা ঃ শ্রমবিভাগ

(Small and Large-Scale Industries : Division of Labour)

শিল্প বলিতে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকেই বুঝাইলেও কৃষি ও শিল্প একই-প্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থা নহে। কৃষি প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এবং শিল্প প্রধানতঃ মানুষের উপর নির্ভরশীল।

শিল্পসমূহকে ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ ও কুটির শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে শিল্পসংস্থায় শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং শ্রমিকের সংখ্যা অন্ততঃ ৫০০ জন তাহাকে বৃহৎ, শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হইতে ৫০০ হইলে তাহাকে মাঝারি এবং শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ অপেক্ষা কম হইলে তাহাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। কোন শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত না হইলে, শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন হইলেও সে শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। শক্তিচালিত যন্ত্রাদির ব্যবহার ছাড়া পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত শিল্পকে কুটিরশিল্প বলা হয়।

বিভিন্ন ধরণের শিল্প

উৎপাদন-ব্যবস্থায় শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রমবিভাগনীতি (পরে বিস্তারিত আলোচনা দেখ) গ্রহণ করার ফলে আধুনিক বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলির উদ্ভব হইয়াছে।

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা (Advantages of Large-Scale Production) ঃ বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) আভ্যন্তরীণ ও (২) বাহ্যিক সুবিধা (internal and external economies)।

আভ্যন্তরীণ সুবিধা ঃ (ক) আজকাল কোন দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিতে (জনপ্রিয় হইলেই বিক্রয় বাড়ে) বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং আধুনিক ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন মাধ্যমে প্রচারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনায় **বিজ্ঞাপনের খরচ কম পড়ে**। (খ) বৃহদায়তন শিল্পসংস্থা এককালে **বহু কাঁচামাল কেনে বলিয়া দরে অনেক সুবিধা পায়**। (গ) বড় কারখানায় **অপচয় কম**। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাহা উদ্‌বৃত্ত পড়িয়া থাকে তাহাকে আবার কাজে লাগাইয়া অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদন করিলে (যাহা বড় কারখানায় সম্ভব) অপচয় কমে। (ঘ) বড় কারখানায় শ্রমবিভাগনীতি অনুসারে ঠিক

আভ্যন্তরীণ সুবিধা
(১) কম খরচে বিজ্ঞাপন
(২) কম দরে মাল কেনা
(৩) কম অপচয়
(৪) কম ব্যয়ে বেশী উৎপাদন (৫) গবেষণা দ্বারা উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থা উদ্ভাবন

কাজে ঠিক লোককে লাগাইবার সুযোগ বেশী। ফলে **কম ব্যয়ে বেশী উৎপাদন** সম্ভব হয়। (৬) একটি বৃহৎ শিল্পসংস্থা বৈজ্ঞানিক **গবেষণা প্রভৃতির সাহায্যে উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের** চেষ্টা করিতে পারে।

বাহ্যিক সুবিধাঃ আজকাল কাঁচামালের সান্নিধ্য, অনুকূল, জলবায়ু, শক্তিসম্পদলাভের সুযোগ এবং চলাচল-ব্যবস্থা ও বাজারের সুবিধার জন্য বৃহৎ শিল্পগুলি দেশের এক বিশেষ অংশে কেন্দ্রীভূত হয় (যেমন কলিকাতার কাছাকাছি গংগার ধারে পাটের কল, বোম্বাই-আমেদাবাদে কাপড়ের কল)। ইহাকে **শিল্পের একদেশতা** (Localisation of Industries) বলে। ইহার ফলে যেখানে কোন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় সেখানকার সকল কারখানাই সেই স্থানের সুনামের ভাগীদার হয় ও সেখানে সেই শিল্পে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া সহজ হয়। **এই সুনাম ও দক্ষ শ্রমিকের সুলভতাই বাহ্যিক সুবিধা।**

বাহ্যিক সুবিধা ঃ
(১) শিল্পের একদেশতা-জনিত সুনাম
(২) দক্ষ শ্রমিকের সুলভতা

উভয়বিধ (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) সুবিধার ফলে বৃহৎ শিল্পসংস্থা-সমূহে উৎপাদনের খরচ কম পড়ে।

বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাঃ কিন্তু প্রত্যেক শিল্পেই আয়তন-বৃদ্ধির সীমা (Limits to large-scale production) আছে। এই সীমা (১) ব্যবসায়ীদের পরিচালন-ক্ষমতার সীমা ও (২) বাজারের সীমা দ্বারা চিহ্নিত।

অসুবিধা ঃ
(১) ব্যবসায়ীদের পরিচালন-ক্ষমতা সীমিত
(২) বাজারের সীমা
(৩) ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী পরিবেষণ অসম্ভব

তা ছাড়া এমন অনেক শিল্প আছে যাহা স্বভাবতঃই বৃহদায়তন হইতে পারে না। যন্ত্র একই ধরণের বহু দ্রব্য উৎপাদন করে। সূক্ষ্ম ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী পরিবেষণ যন্ত্র সাহায্যে সম্ভব নয়। তাই, কাশ্মীরী শাল বা ঢাকাই মসলিন কখনও বহু পরিমাণে যন্ত্রে উৎপাদন করা সম্ভব হইত না।

এ ছাড়া আরও বহু অসুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পে বহু সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে। এত অধিক সংখ্যক শ্রমিকের সংগে মালিকের কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয় ও সে সম্পর্কও থাকে না। এই সম্পর্ক-হীনতার জন্য মালিক-শ্রমিক বিরোধ দেখা দেয় ও উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

(৪) মালিক শ্রমিক বিরোধ

কারখানার কাছাকাছি জায়গায় শ্রমিকদের বাস করিতে হয়। একসংগে বহু লোকের বাসের ফলে বাসস্থানে এক অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়িয়া উঠে এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। স্বাভাবিক গৃহপরিবেশ হইতে দূরে থাকার ফলে এই পরিবেশে শ্রমিকের নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা অধিকতর হয়।

(৫) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি

(৬) শ্রমিকের নৈতিক অবনতি

ক্ষুদ্রশিল্পগুলির সুবিধা (Advantages of Small-scale Production): বৃহৎ শিল্পগুলির সংগে তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পগুলির নানা অসুবিধা থাকিলেও নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির জন্য ক্ষুদ্রশিল্প আজও সর্বত্র টিকিয়া আছে এবং এখনও দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন সুবিধাই ইহার টিকিয়া থাকিবার কারণ

(ক) ইহারা ক্রেতার রুচিমত বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে।

(খ) যে-সব ক্ষেত্রে সচরাচর ক্রেতার রুচি বদলায় (যেমন, অলংকার নির্মাণ) সে-সব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প বিশেষ সুবিধা ভোগ করে ও ক্রেতার পরিবর্তিত রুচি অনুসারে শিল্পদ্রব্য পরিবেষণ করিতে পারে।

(গ) অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয় বলিয়া ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক-শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্ভব। ইহাতে বিরোধের আশংকা কম হয় অথচ মালিক সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে।

(ঘ) উৎপাদক ও ক্রেতার সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ক্ষুদ্রশিল্পের এক সুবিধা।

পূর্বে ক্ষুদ্রশিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হইত না বলিয়া যে অসুবিধা ছিল এখন তাহা দূর করা হইয়াছে। এখন ক্ষুদ্রশিল্পেও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইবার ফলে অনেক মিতব্যয়িতা সম্ভব হইয়াছে।

কুটিরশিল্প (Cottage Industries)—ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ছোট কারখানা ও কুটিরশিল্প। ছোট কারখানা ও বৃহদায়তন কারখানার মধ্যে পার্থক্য কেবল আয়তনগত। কিন্তু কুটিরশিল্প পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত।

অসুবিধা (Disadvantages)—বর্তমানে আমাদের দেশে কুটিরশিল্পগুলিকে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হইতেছে। (ক) এই শিল্পগুলিতে প্রাচীন যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

(খ) শিল্পীদের প্রয়োজনীয় মূলধন নাই। (গ) কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা আছে। (ঘ) শিল্পীরা কাঁচামাল ক্রয় করিতেও নানা অসুবিধা ভোগ করে।

সুবিধা (Advantages)—যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত আমাদের দেশে **কুটির-শিল্পের গুরুত্ব** আজও অনস্বীকার্য। (ক) কুটিরশিল্পে কম মূলধনে বহু লোকের কর্মের সংস্থান হয় এবং এভাবে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে কিছুটা সাহায্য হয়। (খ) বৃহৎ শিল্প ধন-বণ্টনের বৈষম্য তীব্রতর করিয়া তোলে, কিন্তু কুটিরশিল্পের প্রসার ধন-বণ্টনের অসাম্য কমাইতে পারে। (গ) গৃহপরিবেশে পরিচালিত হওয়ায় কুটিরশিল্পে শ্রমিকের নৈতিক মানের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের তুলনায় কম থাকে। (ঘ) কুটিরশিল্পী আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত অবস্থায় মনের সুখে স্রষ্টার আনন্দ লইয়া শিল্প সৃষ্টি করিতে পারে।

সুবিধা :
(১) বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য
(২) ধন-বণ্টনে বৈষম্যের হ্রাস
(৩) নৈতিক মানের অবনতি-সম্ভাবনা কম
(৪) স্রষ্টার আনন্দ

কুটিরশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা (How to improve our Cottage Industries)—(ক) প্রাচীন যন্ত্রপাতি ও প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতির স্থলে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও আধুনিক উৎপাদন-প্রণালী পরীক্ষা ও গ্রহণ করা আবশ্যক। (খ) সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপন করিয়া কারিগরদের মূলধনের অভাব দূর করা দরকার। (গ) কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থায়ও সমবায় নীতি গ্রহণ করা উচিত। (ঘ) প্রচার ও প্রদর্শনী মারফত কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা ও কারিগরদের আধুনিক রুচি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা আবশ্যক। (ঙ) কারিগরদের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ও সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

উন্নতির ব্যবস্থা :
(১) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-প্রণালী প্রবর্তন
(২) সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপন
(৩) ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থায় সমবায় নীতি গ্রহণ
(৪) প্রচার ও প্রদর্শনীর সাহায্য গ্রহণ
(৫) যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষাদান ও সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব (Importance of Cottage Industries in the Five Year Plans)—কুটিরশিল্পের গুরুত্ব ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বীকৃত হইয়াছে। কুটিরশিল্পের ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ছয়টি বোর্ড গঠন করিয়াছেন : নিখিল ভারত তাঁত শিল্প বোর্ড, নিখিল ভারত খাদি গ্রাম্য শিল্প বোর্ড, নিখিল ভারত কুটির

শিল্প বোর্ড, ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড, সিল্ক বোর্ড ও নারিকেল-কাতা শিল্প বোর্ড। ইহা ছাড়া সরকারী বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প-প্রতিষ্ঠান (National Small Industries Corporation) এবং চারিটি ক্ষুদ্রশিল্প-প্রতিষ্ঠান (National Small Industires Service Institute) গঠিত হইয়াছে।

শ্রমবিভাগ (Division of Labour)

উৎপাদন কার্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থার নাম **শ্রমবিভাগ** (Division of Labour)। শ্রমবিভাগ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আজকাল কোন মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করে না। এমনকি একজন শ্রমিকও একটি সম্পূর্ণ দ্রব্য প্রস্তত করে না। একজন লোক কোন দ্রব্য উৎপাদনের এক বিশেষ অংশমাত্র (বা একটি দ্রব্যের এক অংশমাত্র) উৎপাদন করিতে বিশেষ ভাবে শেখে: তেমনি আবার দেশের এক বিশেষ অংশ এক বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে।

শ্রমবিভাগের বিভিন্ন প্রকার (Different forms of Division of Labour)

(১) সরল শ্রমবিভাগ: এইরূপ শ্রমবিভাগে একজন লোকই একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজ সম্পূর্ণ করে। সরল শ্রমবিভাগ আবার দুইরকম হইতে পারে: ব্যবসায়- ও বৃত্তি-গত বিভাগ (Division into trades and professions) এবং (খ) সম্পূর্ণ স্তর-বিভাগ (Division into complete processes)।

সরল শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের:

(ক) একজন লোক একটি দ্রব্য উৎপাদনের সকল স্তরের কাজ একা করিলে তখন সমগ্র উৎপাদন ক্রিয়াকে ব্যবসায়- বা বৃত্তি-গত শ্রমবিভাগ বলে। তাঁতির কাপড় বোনা, কুমোরের মাটির জিনিসপত্র তৈয়ারী করা ব্যবসায়- ও বৃত্তি-গত শ্রমবিভাগ।

(ক) ব্যবসায়- ও বৃত্তি-গত বিভাগ

(খ) একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি স্তরের কাজ শেষ হইলেই একটি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

এইরূপ প্রত্যেক স্তরের যে শ্রমবিভাগ তাহাই সম্পূর্ণ স্তর বিভাগ। জুতা তৈয়ারীর কাজের কথাই ধরা যাক। প্রথমে দেখা যায় এক ব্যক্তি চামড়া সংগ্রহ করিয়া তাহা শোধন (tan) করিয়া বিক্রয় করে। মুচি জুতা তৈয়ারীর জন্য তাহার নিকট সেই চামড়া কেনে। জুতা তৈয়ারীর কাজে চামড়া শোধন একটি সম্পূর্ণ স্তর।

(খ) সম্পূর্ণ স্তর বিভাগ

(২) জটিল শ্রমবিভাগ : আধুনিক শ্রমবিভাগ জটিল। এখনকার বৃহদায়তন শিল্পগুলিতে উৎপাদনকে অসংখ্য অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। একজন শ্রমিক একটি অংশের কাজ মাত্র করে এবং তাহার শ্রমদ্বারা উৎপাদনের কোন স্তর সম্পূর্ণ হয় না। ইহাকে অসম্পূর্ণ স্তরের শ্রমবিভাগ বলে। কুটিরশিল্পী কোন মুচি একজোড়া জুতা হয়তো নিজেই তৈয়ারী করে, কিন্তু বাটা কোম্পানীর কারখানায় গেলে দেখিতে পাইবে জুতা তৈয়ারীর কতই না স্তর-বিভাগ। কোথাও হয়তো শুধু সুখতলা হইতেছে। কোথাও গোড়ালি, কোথাও তলা, কোথাও বা উপরের বিভিন্ন অংশ। আবার দেখিবে এক এক জায়গায় এক এক অংশ জোড়া হইতেছে। এইভাবে বিভিন্ন স্তরের কাজ সমন্বিত করিয়া তবেই একটি সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ারী হইতেছে।

জটিল বা অসম্পূর্ণ স্তর-বিভাগ

(৩) নানা কারণে বিশেষ এক অঞ্চলে এক বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদনে কতগুলি বিশেষ সুবিধা থাকে। ইহাকে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Territorial Division of Labour) বলে।

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

শ্রমবিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labour) **:** (১) শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। (২) এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ সম্ভব হয়। (৩) শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। (৪) বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করা যায় ও যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাড়ে। (৫) একজন শ্রমিকের সম্পূর্ণ কাজ শিখিতে যত সময় লাগে অংশমাত্র শিখিতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগে। তাছাড়া একই কলে একজন শ্রমিক সারাক্ষণ কাজ করে—যন্ত্রাদি পরিবর্তনে সময়ের অপচয় হয় না।

সুবিধা :
(১) উৎপাদন বৃদ্ধি
(২) বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ
(৩) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি
(৪) বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধি
(৫) সময়ের সদ্ব্যবহার

শ্রমবিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour) : (১) সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের কাজের একঘেয়েমি বাড়ে ও সম্পূর্ণ একটি দ্রব্য উৎপাদনের যে আনন্দ তাহা শ্রমিকের থাকে না। ফলে শ্রমিকের শ্রম করিবার শক্তি ক্রমশঃ কমিতে থাকে। (২) শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠে। কিন্তু ঐ সমস্ত বড় বড় কারখানায় শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বস্তিও গড়িয়া উঠে; এবং বস্তির পরিবেশ শ্রমিকের নৈতিক অবনতি ঘটায়।

অসুবিধা

তবে, শ্রমবিভাগের ফলে অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধা বেশী হইয়াছে; প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের ফলে জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত হইয়াছে।

বৃহৎ শিল্পের মত উহার আনুষংগিক শ্রমবিভাগের সীমাও বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে। বাজারের আয়তন (ক্রেতার সংখ্যা ও চাহিদা) কম হইলে শ্রমবিভাগ কম হইবে। বাজারের আয়তন বাড়িলে শ্রমবিভাগ সূক্ষ্মতর করিয়া অধিক উৎপাদন লাভজনক হইবে।

সীমিত শ্রমবিভাগ

প্রশ্নাবলী

১। বৃহৎ শিল্প সংস্থার উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। (Discuss the advantages and disadvantages of large-scale production.) [পৃঃ ৪১-৪৩ দেখ]

২। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা তুলনা কর। (Compare the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production.) [পৃঃ ৪১-৪৩ দেখ]

৩। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পের গুরুত্ব ও অসুবিধা দূরীকরণের উপায় ও ব্যবস্থা আলোচনা কর। (Discuss the importance and difficulties of cottage industries in India. How can the difficulties be removed? What steps have been taken to remove them?) [পৃঃ ৪৩-৪৪ দেখ]

৪। শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার শ্রমবিভাগ কী কী? শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। (What is division of labour? What are the advantages and disadvantages of division of labour?) [পৃঃ ৪৫-৪৭ দেখ]

অর্থ

(Money)

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীনকালে দ্রব্য-বিনিময় (barter) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একজন তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের নিকট হইতে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা ছিল অনেক এবং সেই জন্য আধুনিক মানুষের জটিল অর্থনৈতিক জীবনে সে ব্যবস্থা অচল।

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা : দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থায় একজনের অভাবের সহিত অপর একজনের অভাবের সংযোগ ও সাপেক্ষত্ব অত্যাবশ্যক। মনে করা যাক, কোন জেলে হয়তো মাছের বিনিময়ে তাঁতির কাছ হইতে কাপড় সংগ্রহ করিতে চাহিল। কিন্তু তাঁতির হয়তো মাছের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে তো আর ঐ জেলের পক্ষে মাছের বিনিময়ে কাপড় পাওয়া সম্ভব হইবে না।

আবার, কোন জিনিসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রয়োজনমতো অন্য জিনিসের সহিত বিনিময় করিতে গেলে অনেক সময় ঐ জিনিসটির হয়তো জিনিস হিসাবে কোন মূল্যই থাকিবে না। যেমন, একটি গরু বা ঘোড়াকে খণ্ডখণ্ড করিয়া অন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের বিনিময় করিতে গেলে প্রতি খণ্ডের মাংস হিসাবে অতি অল্প কিছু দাম থাকিলেও গরু বা ঘোড়ার উপযোগিতা বা মূল্য তাহার আর থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একজনের অভাবের সংগে অন্য একজনের অভাবের সাপেক্ষত্ব থাকিলেও দ্রব্য-বিনিময় সর্বদা সম্ভব হয় না।

অসুবিধা

দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার অপর অসুবিধা এই যে এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না।

এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের উদ্ভাবন।

অর্থ কী (What is Money ?) : সাধারণ কথায় অর্থ বলিতে আমরা নানাপ্রকার মুদ্রা ও কাগজের নোট বুঝি। কিন্তু সকল মুদ্রাই অর্থ নয়। কিছুকাল-আগে-পর্যন্ত-প্রচলিত হলদে দু-আনি এখন চলে না সুতরাং অর্থ নয়। যাহা জনসাধারণ সর্বদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং যাহা দ্বারা দেনা-পাওনা, বেচা-কেনার হিসাব-নিকাশ করা যায় তাহাই অর্থ।

অর্থের গুণাবলী (Qualities of Good Money) ঃ এমন দ্রব্যই অর্থ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (ক) যাহা সকলে গ্রহণে রাজী থাকিবে, (খ) যাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে, (গ) যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে বহনযোগ্য হইবে, (ঘ) যাহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে।

অর্থের গুণাবলী

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে নানা দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অর্থের অত্যাবশ্যক এই সমস্ত গুণ সোনা-রূপায় আছে বলিয়া সোনা-রূপাই কালক্রমে সব দেশে অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অবশ্য আজকাল কাগজের নোট (কাগজী মুদ্রা) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোনা-রূপার মুদ্রার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কাগজের নোট-এরও অর্থের প্রধান প্রধান গুণাবলী আছে।

কাগজী মুদ্রা

বিভিন্ন প্রকার অর্থ (Different kinds of Money) ঃ (১) **বিহিত অর্থ** (Legal Tender)—কতকগুলি মুদ্রা সরকারী অনুশাসন অনুসারে সকলেই লইতে বাধ্য। পাওনাদার ও দোকানদার দেনদার বা ক্রেতার নিকট হইতে সে মুদ্রা লইতে অস্বীকার করিলে তাহার অস্বীকৃতি বে-আইনী ও দণ্ডনীয় হয়। এ-জাতীয় মুদ্রা বিহিত অর্থ।

বিহিত অর্থ দুই প্রকার—**অসীম ও সসীম** (unlimited and limited legal tender)। অসীম বিহিত অর্থ, সরকারী বিধান অনুসারে, পাওনাদার যে কোন পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য। সসীম বিহিত অর্থ সরকার-নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দিতে চাহিলে পাওনাদার গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়।

দুই প্রকার বিহিত অর্থ ঃ অসীম ও সসীম

প্রামাণিক অর্থ ও নিদর্শক অর্থ (Standard money and token money) ঃ দেশে যাহা বিনিময়ের মান ও যে মুদ্রায় দেশের সর্বত্র হিসাবপত্র রাখা হয় তাহাই **প্রামাণিক অর্থ**। পূর্বে সোনা বা রূপার মুদ্রাই ছিল প্রামাণিক অর্থ। তখন এই মুদ্রার অন্তর্নিহিত সোনা বা রূপার মূল্য সে-ওজনের সোনা বা রূপার বাজার দরের সমান ছিল। কিন্তু এখন আর সেইরূপ নহে। আমাদের দেশে টাকা, ইংল্যাণ্ডে পাউণ্ড স্টার্লিং ও আমেরিকায় ডলার প্রামাণিক অর্থ। তবে এখন কাগজের নোটই প্রামাণিক অর্থ হিসাবে প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। প্রামাণিক অর্থ অসীম বিহিত অর্থরূপে পরিগণিত হয়।

প্রামাণিক অর্থ

নিদর্শক অর্থের অন্তর্নিহিত ধাতুর মূল্য মুদ্রার মূল্য অপেক্ষা কম হয়। এ জাতীয় মুদ্রা অবাধভাবে প্রস্তুত হয় না। প্রয়োজন অনুসারে সরকার এ জাতীয় মুদ্রা চালু করে। অনেক দেশে এ জাতীয় মুদ্রা সসীম বিহিত অর্থরূপে গণ্য। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত এ জাতীয় মুদ্রাকে (আধুলি, সিকি, নয়া পয়সা) অসীম বিহিত অর্থ বলা চলে।

নিদর্শক অর্থ

আগেই বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশে টাকা প্রামাণিক অর্থ। কিন্তু আমাদের দেশের টাকার (ধাতু বা কাগজের) উপাদানভূত ধাতুর বা কাগজের মূল্য মুদ্রা হিসাবে টাকার যা সরকার-নির্দিষ্ট মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম। তাই বলা যায় যে টাকার প্রামাণিক ও নিদর্শক দুই প্রকার অর্থের বিশিষ্টতাই আছে।

টাকার অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা নাই। সরকারই কেবল টাকা তৈয়ারী করিতে পারে।

কাগজী অর্থ (Paper Money) : কাগজী অর্থ তিন প্রকারের—(১) **প্রতিভূ** (Representative), (২) **পরিবর্তনীয়** (Convertible) ও (৩) **অপরিবর্তনীয়** (Inconvertible)।

তিন প্রকার কাগজী অর্থ: (১) প্রতিভূ, (২) পরিবর্তনীয়, (৩) অপরিবর্তনীয়

(১) সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী অর্থ চালু করে এবং কাগজী অর্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা রূপা জমা রাখা হয়। কাগজী অর্থের মূল্য ও সংরক্ষিত ধাতুমূল্য সমান হইলে কাগজী অর্থকে **প্রতিভূ কাগজী অর্থ** (Representative Paper Money) বলা হয়।

(২) কাগজী অর্থের বিনিময়ে সমান মূল্যের ধাতব মুদ্রা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে সেই কাগজী অর্থকে **পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা** (Convertible Paper Money) বলা হয়। আমাদের দেশের কাগজী অর্থ (এক টাকার নোট বাদে) পরিবর্তনীয়।

(৩) রিজার্ভ ব্যাংক কাগজী অর্থের বিনিময়ে সমমূল্যের ধাতব মুদ্রা বা এক টাকার নোট দেয়। কাগজী অর্থের বিনিময়ে ধাতব মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সে কাগজী অর্থকে **অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ** (Inconvertible Paper Money) বলা হয়।

অর্থের কাজ (Functions of Money) : (১) অর্থ প্রধানতঃ দ্রব্য

বিনিময়ের মাধ্যম। আমরা এখন আর একটি দ্রব্য দিয়া আর একটি দ্রব্য কিনি না (দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)—টাকা-পয়সা দিয়া দ্রব্য কিনি।

অর্থের কাজ

(২) অর্থ দিয়া **দ্রব্যমূল্য** নিরূপিত হয়। একখানা কাপড় ছ' টাকা দিয়া কিনিলে আমরা বলি যে কাপড়খানার মূল্য ছ' টাকা।

(৩) অর্থ **সঞ্চয়ের বাহন**। যে-কোন জিনিসের বহু পরিমাণ সঞ্চয়ের যে সকল অসুবিধা বহু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ে সে সকল অসুবিধা নাই। তা ছাড়া যে দ্রব্য কেহ সঞ্চয় করে তাহা নষ্ট হইয়া গেলে বা তাহার মূল্য স্থির না থাকিলে (কমিয়া গেলে) সঞ্চয়কারীর লোকসান হয়। সঞ্চিত অর্থের অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা নষ্ট হইবার আশংকা কম এবং অর্থের মূল্য সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থির থাকে।

(৪) অর্থের মূল্যের স্থিরতা হেতু ইহা **দেনাপাওনার** হিসাব-নিকাশের **উত্তম মান**। আজ মহাজন যে টাকা ধার দেয় কিছুকাল পরে সে তাহা ফেরত পায়। অর্থের মূল্য দীর্ঘকাল স্থির থাকে বলিয়া মহাজনের লোকসানের আশংকা থাকে না।

অর্থের মূল্য (Value of Money)

অর্থের মূল্য বলিতে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায়। যদি এক টাকায় পাঁচ সের আলু কেনা যায় তবে বলা যাইবে টাকার মূল্য পাঁচ সের আলু। টাকায় চার সের আলু মাত্র পাওয়া গেলে টাকার মূল্য কমিল এবং ছ'সের আলু পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বাড়িল।

দেখা যাইতেছে দ্রব্য-মূল্যের সংগে টাকার মূল্য বাড়ে-কমে। দ্রব্য-মূল্য বাড়িলে টাকার মূল্য কমে এবং দ্রব্য-মূল্য কমিলে টাকার মূল্য বাড়ে।

মূল্যস্তর (Price-level) **:** বহু জিনিসের দামের গড়পড়তা হিসাবের সংখ্যাকে **সাধারণ মূল্যস্তর** (General Price-level) বলা হয়। সাধারণ মূল্যস্তর বাড়া বা কমা মানে অধিকাংশ দ্রব্যের মূল্য বাড়া বা কমা। মূল্যস্তর বাড়া অর্থ টাকার মূল্য কমা এবং মূল্যস্তর কমা মানে টাকার মূল্য বাড়া। তাই, টাকার মূল্য বা সাধারণ মূল্যস্তর একই নীতিতে নির্ধারিত করা যায়।

সাধারণ মূল্যস্তর মূল্যস্তর চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভরশীল

টাকার মূল্য বা সাধারণ মূল্যস্তর টাকার চাহিদা (demand) **ও যোগান** (supply) **বাড়া-কমার উপর নির্ভর করে।**

টাকার চাহিদা ঃ দ্রব্যাদি কিনিবার সময় বেশী দ্রব্য কিনিতে বেশী টাকার চাহিদা হয় ও কম দ্রব্য কিনিতে কম টাকার চাহিদা হয়। তাই টাকার চাহিদা বিক্রেয় দ্রব্যের কমবেশী পরিমাণেরও উপর নির্ভর করে।

টাকার যোগান

টাকার যোগান অর্থ বাজারে যত মুদ্রা ও কাগজের নোট চলতি আছে তাহার সমষ্টি। সরকার কর্তৃক টাকার যোগান যে পরিমাণে যে সময়ের মধ্যে বাড়ান সম্ভব জিনিসের উৎপাদন সে পরিমাণে বা তত অল্প সময়ে বাড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং টাকার যোগান বাড়িলে বা কমিলে টাকার মূল্য বা সাধারণ মূল্যস্তর বাড়িবে বা কমিবে। টাকার যোগান বাড়িলে টাকার মূল্য কমিবে ও সাধারণ মূল্যস্তর বাড়িবে ঃ টাকার যোগান কমিলে টাকার মূল্য বাড়িবে ও সাধারণ মূল্যস্তর কমিবে। তাই, কোন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার মূল্য টাকার যোগান বা পরিমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়। ইহাই **টাকার পরিমাণতত্ত্ব** (Quantity theory of Money)।

টাকার পরিমাণতত্ত্ব

একটি সমীকরণের (equation) সাহায্যে তত্ত্বটি প্রকাশ করা যায় ঃ

$P=\frac{M}{T}$ [P = মূল্যস্তর, M = টাকার যোগান, T = বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণ = টাকার চাহিদা]

মনে করা যাক, বাজারে ১০০ মণ পাট আছে (T) ; ক্রেতাদের হাতে আছে ২০০০৲ টাকা (M) ; এক্ষেত্রে পাটের দাম (P) মণ প্রতি ২০৲ হইবে।

$$\left[\frac{\text{২০০০৲ (M)}}{\text{১০০ মণ (T)}} = \text{২০৲ (P)}\right]$$

টাকার প্রচলনবেগ

টাকার যোগান হিসাব করিতে **টাকার প্রচলন-বেগ** (Velocity of circulation of money = V) বিশেষভাবে বিবেচ্য। মনে করা যাক, একজন এক টাকার মাছ কিনিল, মাছওয়ালা আবার সেই এক টাকা দিয়া চাল কিনিল, চালওয়ালা আবার সেই এক টাকা দিয়া একখানা গামছা কিনিল। একই দিনে এইভাবে হাত বদলের ফলে এক টাকা তিন টাকার কাজ করিল। এই ভাবে একটি টাকা কোন নির্দিষ্ট সময়ে যতবার কেনাবেচায় ব্যবহৃত হয় তাহাকে টাকাটির প্রচলন-বেগ বলা হয়। মোট টাকার যোগানকে সেই টাকার প্রচলন-বেগ দ্বারা গুণ করিলে সেই গুণফল দ্বারা মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ জানা যায়, অর্থাৎ MV = মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ।

সুতরাং টাকার প্রচলন-বেগকে হিসাবে ধরিলে পূর্বের সমীকরণটি হইবে

$$P = \frac{MV}{T}$$

আজকাল কেনা-বেচার ব্যাপারে নগদ টাকার পরিবর্তে চেকও (cheque) ব্যবহৃত হয়। ব্যাংকে যাহাদের টাকা জমা আছে তাহারা চেক কাটিতে পারে এবং চেকও একাধিকবার বেচাকেনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং টাকার যোগান হিসাব করিতে ব্যাংক-সমূহের মোট আমানত টাকা ও সেই টাকার প্রচলন-বেগও বিবেচ্য।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণকে M' ও সেই টাকার প্রচলন-বেগকে V' ধরিলে সমীকরণটি হয়— $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

টাকার পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা

(Criticism of the Quantity Theory of money) :

টাকার পরিমাণ-তত্ত্বে টাকার চাহিদা বা T-কে টাকার যোগানের সহিত তুলনায় অপরিবর্তনীয় ধরা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য নহে। কোন দেশে টাকার যোগান বাড়িলে সে দেশের টাকার চাহিদা বা বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণও বাড়ান সম্ভব হয়। তাই, এ তত্ত্ব মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যখন উৎপাদনে আর নূতন লোক নিয়োগ সম্ভব নয় অর্থাৎ কেহই বেকার নাই সে অবস্থায়ই এ তত্ত্ব সত্য হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে চাহিদা ও যোগান দুয়েরই বাড়া-কমার সংগে টাকার মূল্যের কম-বেশী হওয়া জড়িত এবং টাকার চাহিদা ও যোগান দুই-ই পরিবর্তনীয়।

সূচক সংখ্যা (Index Number)ঃ অর্থের মূল্য স্থির করিতে সাধারণ ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসের যে গড়পড়তা মূল্য স্থির করা হয় তাহাকে সূচক সংখ্যা (Index Number) বলা হয়। বিভিন্ন সময়ের সূচক সংখ্যা তুলনা করিয়া অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়।

সূচক সংখ্যা

প্রথমে কোন বিশেষ বৎসর বা সময়কে ভিত্তি (base) করা হয়। তারপর সেই বৎসর বা সময়ের সাধারণ ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা মূল্য স্থির করা হয়। তারপর পরবর্তী কোন বৎসর বা সময়ের সাধারণ ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসের (জিনিসগুলি একই হইবে) গড়পড়তা মূল্য স্থির করা হয়। ভিত্তিকালের সূচক সংখ্যা হইতে এবারের সূচক সংখ্যা যদি বেশী হয় তখন বলা

হয় যে জিনিসের দাম বাড়িয়াছে। আর যদি সূচক সংখ্যা কম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে জিনিসের দাম কমিয়াছে বা টাকার দাম বাড়িয়াছে।

উদাহরণ ঃ ভিত্তি বৎসর (Base Year)—১৯৫৭

সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস

চাল	প্রতি মণ	২০৲	=১০০
ডাল	"	১৫৲	=১০০
চিনি	"	২৫৲	=১০০
মাছ	"	৮০৲	=১০০
		মোট	৪০০

ভিত্তি বৎসরের প্রত্যেক জিনিসের দাম ১০০ ধরা হয়। চারটি জিনিসের দাম ৪০০। সুতরাং গড়পড়তা দাম বা সূচক সংখ্যা

=৪০০÷৪

=১০০।

(পরবর্তী কোন বৎসরের সূচক সংখ্যা বা গড়পড়তা দাম)

	প্রতি মণ	১৯৬০	
চাল	২৫৲	=১২৫	[২০৲=১০০ হইলে
ডাল	২৫৲	=১৬৬	২৫৲=$\frac{১০০}{২০}$×২৫=১২৫]
চিনি	৪৪৲	=১৭৬	
মাছ	১২০৲	=১৫০	
		৬১৭	

অর্থাৎ ১৯৬০ সালে চাল-ডাল-চিনি-মাছের গড়পড়তা মূল্য=৬১৭÷৪ =১৫৪·২৫। এখন দুইটি সূচক সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯৬০ সালে জিনিস চারটির দাম শতকরা ৫৪·২৫ (১৫৪·২৫−১০০=৫৪·২৫) ভাগ বাড়িয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও **মূল্যহ্রাস** (Inflation and Deflation) ঃ যখন কোন দেশে সকল কর্মক্ষম লোকের নিয়োগের পরও আর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না তখনও সরকার বাজারে অধিক পরিমাণে মুদ্রা চালু করিলে, জিনিসের যোগানের তুলনায় টাকার যোগান বেশী হয়, লোকের আয় বাড়িতে থাকে ও জিনিসের দাম বেশী হয়। এ অবস্থাকে **মুদ্রাস্ফীতি** বা Inflation বলা হয়। আর জিনিসপত্রের যোগানের তুলনায়

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যহ্রাস

লোকের আয় কমিতে থাকিলেও জিনিসপত্রের দাম কমিলে (মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা) সে অবস্থাকে **মূল্যহ্রাস** বা Deflation বলা হয়।

মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের ফল (Effect of rising and falling prices): প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের অধিকাংশ লোকের দুর্গতি হয়। নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের (সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিয়া, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতির) অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাহাদের আয় একই থাকে অথচ জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, তাই তাহারা কম জিনিস কিনিতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। এই সকল লোকের সংগে সংগে তাহাদের পোষ্যবর্গও বহু কষ্ট ভোগ করে।

মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ লোকের অসুবিধা

মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের কষ্ট বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলন করিয়া বর্ধিত হারে মজুরী বা মাগ্‌গীভাতা আদায় করিতে পারিলেও, তাহাদের আয়বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কমই হয়।

ব্যবসায়ীদের সুবিধা

মূল্যবৃদ্ধির ফলে একমাত্র ব্যবসায়ীদের ও মহাজনদের মুনাফা ও আয় বাড়ে।

মূল্যহ্রাসের ফল বিপরীত

মূল্যহ্রাসের ফলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ও শ্রমিকদের সুবিধা হয় ও ব্যবসায়ীদের আয় কমে। তবে মূল্যহ্রাসের ফলে ব্যবসায়ীদের লোকসান হইতে থাকিলে তাহারা শ্রমিক ছাঁটাই করিতে পারে। তাই শ্রমিকদের বেকারির আশংকা বাড়ে।

প্রশ্নাবলী

১। কেনা-বেচার ব্যাপারে দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা বর্ণনা কর। অর্থের উদ্ভাবনে সেই সমস্ত অসুবিধা কিভাবে দূর হইল বল।

(Describe the difficulties and inconveniences attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money.) [পৃঃ ৪৮ দেখ]

২। অর্থ হিসাবে নির্বাচিত দ্রব্যের গুণাবলী বর্ণনা কর।

(What are the qualities to be looked for in the commodity selected as money ?) [পৃঃ ৪৯ দেখ]

৩। অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(Describe the functions of money.) [পৃঃ ৫০-৫১ দেখ]

৪। অর্থের মূল্য বলিতে কি বোঝ?

(What is meant by the value of money ?) [পৃঃ ৫১-৫৩ দেখ]

৫। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যহ্রাস বলিতে কি বোঝ? কোন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর।

(What do you mean by inflation and deflation ? What are their effects on the different classes of people in a country ?)

[পৃঃ ৫৪-৫৫ দেখ]

৬। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

(State and explain the Quantity Theory of Money.)

[পৃঃ ৫২-৫৩ দেখ]

৭। টীকা লিখ:

অসীম ও সসীম বিহিত অর্থ, প্রামাণিক ও নিদর্শক অর্থ, প্রতিভূ কাগজী অর্থ, সূচক সংখ্যা।

(Write notes on : Unlimited and limited legal tender money, standard money and token money, representative paper currency, index number.) [পৃঃ ৪৯-৫০, ৫৩-৫৪দেখ]

ব্যাংক ব্যবস্থা

(Banking)

ব্যাংক : আগেই বলা হইয়াছে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের অন্যতম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কোন দেশের উন্নতিও দেশের মোট সঞ্চিত অর্থের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। দেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের সঞ্চয় থাকে তবে সেই অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্যে, নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগাইয়া দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে রাখিতে হইলে দেশে নির্ভরযোগ্য এবং উপযুক্ত সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান থাকা চাই। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইবে টাকা জমা রাখা এবং সেই টাকা হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ধার দেওয়া।

ব্যাংক কাহাকে বলে

এই দুইটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাজের সুবিধার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাকেই বলা হয় ব্যাংক।

বিভিন্ন ধরণের ব্যাংক : ব্যাংক অনেক রকমের আছে। তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থিত হইল **কেন্দ্রীয় ব্যাংক** (Central Bank)। দেশের মধ্যে যত ব্যাংক রহিয়াছে সবগুলিকে সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রণ করে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইহা দেশের সরকারের অর্থ আমানত রাখে, দরকার হইলে সরকারকে ধারও দেয়। দেশের অন্য সব ব্যাংকও আমানত রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে, বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাহার নিকট হইতে ধারও পায়। লাভ করা লক্ষ্য না হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যে সাধারণ ব্যাংকগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে না। নোট ছাপার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এবং এই ব্যাংক-নোট অর্থের সমতুল্য কাজ করে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank)। ইহার মালিক ভারত সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তাহার কাজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত আর সব ব্যাংক ইহাদের গঠন ও কাজের বৈশিষ্ট্য

অনুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, যে ব্যাংক সমবায় পদ্ধতিতে গঠিত তাহাকে বলা হয় সমবায় ব্যাংক (Co-operative Bank); যৌথমূলধনী পদ্ধতিতে গঠিত ব্যাংককে বলা হয় যৌথমূলধনী ব্যাংক (Joint Stock Bank)। অনেক ব্যাংক আছে যাহারা দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তিতে টাকা আমানত রাখে ও ধার দেয়। সেগুলিকে বলে মর্টগেজ ব্যাংক (Mortgage Bank)। যে সব ব্যাংক স্বল্প মেয়াদের চুক্তিতে টাকা আমানত রাখে ও ধার দেয় সেগুলিকে বলে কমার্শিয়াল ব্যাংক (Commercial Bank)। এক ধরণের কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে যাহারা প্রধানতঃ এক দেশের অর্থের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ সরবরাহ করে। ইহাদিগকে এক্সচেঞ্জ ব্যাংক (Exchange Bank) বলে।

সমবায় ব্যাংক
যৌথমূলধনী ব্যাংক
মর্টগেজ ব্যাংক

কমার্শিয়াল ব্যাংক
এক্সচেঞ্জ ব্যাংক

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Banks): আগেই বলা হইয়াছে, ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ লোকের গচ্ছিত অর্থ আমানত (deposit) রাখা। আমানত সাধারণতঃ তিন রকমের হয়—কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট।

ব্যাংকের কাজ:
(১) আমানত রাখা

কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা রাখিলে আমানতকারী প্রত্যেক সপ্তাহে যতবার খুশি এবং যত পরিমাণে খুশি (অবশ্য আমানতের পরিমাণ না ছাড়াইয়া) টাকা তুলিতে পারে। তবে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যাহা আমানত রাখা হয় তাহার জন্য ব্যাংক আমানত-কারীকে কোন সুদ দেয় না।

কারেন্ট অ্যাকাউন্ট

সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (Savings Bank Account) টাকা তোলার বার এবং পরিমাণ সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিনিষেধ থাকে; যেমন, কোথাও বা নিয়ম থাকিতে পারে সপ্তাহে একবারের বেশী এবং সেই একবারে মোট আমানতের এক-চতুর্থাংশের বেশী তোলা যাইবে না। কোথাও বা দেখা যাইবে যে নিয়ম আছে যে সপ্তাহে এক বারের বেশী টাকা তোলা যাইবে না, তবে পরিমাণ যত খুশি তোলা যাইবে। বিভিন্ন ব্যাংকে এইরূপ বিভিন্ন রকমের নিয়ম বলবৎ থাকে, তবে একটা না একটা নিয়ম থাকেই। সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমানত রাখিলে ব্যাংক আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়।

সেভিংস ব্যাংক
অ্যাকাউন্ট

ফিক্সড্ ডিপোজিট (Fixed Deposit) অ্যাকাউণ্টে নিয়ম থাকে যে নির্দিষ্ট একটা সময় (৬ মাসও হইতে পারে, ৬ বৎসরও হইতে পারে) অতিক্রান্ত না হইলে আমানতকারী তাহার আমানত তুলিয়া লইতে পারে না।

ফিক্সড্ ডিপোজিট অ্যাকাউণ্ট

ফিক্সড্ ডিপোজিটের বেলায় ব্যাংক আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয় এবং এক্ষেত্রে সুদের হার সেভিংস্ ব্যাংক অ্যাকাউণ্টের চেয়ে বেশী হয়। অবশ্য নিয়মভঙ্গ করিয়াও আমানত তোলা যায়, তবে এরূপ করিলে আমানতকারীর আর্থিক লোকসান হয়।

ব্যাংকের দ্বিতীয় কাজঃ টাকা ধার দেওয়া

ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ আমদানী টাকা হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা সম্ভাবনাযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ধার দেওয়া। ধার দিবার সময় ব্যাংক সব ক্ষেত্রেই সুদ নেয়। তবে সব ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের কড়ারে ধার দেওয়া হয়।

সুদ দুই রকমের:
(১) ইণ্টারেস্ট
(২) ডিসকাউণ্ট

সুদ আবার দুই রকমের। যদি ধার দেওয়ার পরে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সুদ আদায় করা হয় তাহা হইলে সেই সুদকে বলা হয় 'ইণ্টারেস্ট' (Interest)। আর যদি ধার দেওয়ার সময়েই (পরে নহে) আসল হইতে সুদের পরিমাণ কাটিয়া লইয়া বাকিটা খাতককে দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সুদকে বলা হয় 'ডিস্কাউণ্ট' (Discount)। যেমন, যদি ডিস্কাউণ্ট শতকরা ২ টাকা হয়, তাহা হইলে ব্যাংক ১ বৎসরের কড়ারে ১০০ টাকা ধার দিবার সময় খাতককে দিবে ৯৮ টাকা, খাতক এক বৎসর পরে ব্যাংককে ১০০ টাকা দিয়াই ধার শোধ করিবে। ডিস্কাউণ্টের হার সর্বত্রই ইণ্টারেস্টের হারের চেয়ে কম।

যে ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে ধার দিয়া কৃষি-শিল্পের মূলধন যোগায় সেরূপ ব্যাংককে সাধারণতঃ এগ্রিকালচারাল বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মর্টগেজ ব্যাংক বলে। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি প্রধানতঃ স্বল্পমেয়াদী (short-term) ধারের ব্যবসায় করে।

ঋণদান-পদ্ধতি ঃ ব্যাংক (বিশেষতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংক) মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া ধার দেয়ঃ (১)

ওভারড্র্যাফট পদ্ধতি

ওভারড্র্যাফট (overdraft) পদ্ধতি। কোন কোন আমানতকারীর উপর কোন কোন ব্যাংকের এত বেশী আস্থা থাকে যে সেই ব্যাংক ঐ আমানতকারীকে তাহার আমানত অপেক্ষা

বেশী টাকাও ধার দেয়। আমানতকারী যখন এইরূপ আমানত-অতিরিক্ত টাকা তোলে তখন ইহার জন্য ব্যাংক সুদ পায়।

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী বন্ধক (security) রাখিয়া এবং প্রতিশ্রুতিপত্র (promissory note) লইয়া অথবা কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতিপত্র লইয়া ধার দেওয়া। মনে করা যাক, কোন এক ব্যবসায়ী কোন এক ব্যাংকের নিকট ৬ মাসের জন্য ৫০০০০৲ ধার চাহিল। ব্যাংক হয়তো নিম্নলিখিত সর্তাধীনে তাহাকে ঐ টাকা ধার দিতে রাজী হইল। মনে করা যাক, সর্ত এই রকম হইলঃ ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে কোন এক বিশ্বাসভাজন কোম্পানীর কিছুসংখ্যক শেয়ার অথবা যেখানে তাহার ব্যবসায়ের মালপত্র আছে সেই গুদামের রসিদ অথবা অন্য কোন মূল্যবান জিনিস (ধার সময়মত শোধ করিতে না পারিলে যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারে) ব্যাংকে বন্ধক রাখিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে এক প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে ছয় মাস পরে সে উক্ত টাকা শোধ করিয়া দিবে। ব্যবসায়ী ঐ সর্ত যথারীতি পূরণ করিবার পর ব্যাংক তাহাকে টাকা ধার দিল। যদি ইণ্টারেস্টের (ধরা যাক বছরে ৬% হারে) চুক্তি থাকে তাহা হইলে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ব্যাংক হইতে ৫০০০০৲ টাকা নিয়া ছয় মাস পরে ব্যাঙ্ককে ৫১৫০০৲ টাকা দিবে। আর ডিস্কাউন্টের (ধরা যাক বছরে ৪% হারে) চুক্তি থাকিলে ব্যবসায়ী ব্যাংক হইতে ৪৯০০০৲ টাকা নিয়া ছয় মাস পরে ব্যাংককে ৫০০০০৲ দিবে।

বন্ধক ও প্রতিশ্রুতিপত্র লইয়া ধার দেওয়া

(৩) ব্যাংকগুলি বিভিন্ন প্রকারের বিল (bills) অথবা সরকারী ঋণপত্র (Government security) ক্রয় করিয়াও ধার দিয়া থাকে। যে প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া একজন দেনাদার (debtor) পাওনাদারকে (creditor) একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহাকে বিল (Bill) বলে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই রকম অনেক বিলই বেশ বিশ্বাসযোগ্য। মনে করা যাক, পাওনাদারের হয়তো কোন কারণে ঐ প্রতিশ্রুত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই অর্থের প্রয়োজন হইল। সে তখন ঐ প্রতিশ্রুতিপত্র কোন ব্যাংকের নিকট লইয়া যাইবে। ব্যাংক ডিস্কাউন্ট হিসাবে কিছু কাটিয়া লইয়া উক্ত পাওনাদারকে বিল-এর বাকী টাকাটা দিয়া দিবে। এইভাবে ব্যাংক বিলটি কিনিয়া লয় এবং ঐ প্রতিশ্রুতি-

Billবা Govt. security ক্রয় করিয়া ধার দেওয়া

পত্রের বলে যথাসময়ে প্রথমোক্ত দেনাদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করে। অর্থাৎ বিলটি কিনিয়া লইয়া ব্যাংক উক্ত দেনাদারের মহাজন (creditor) হইয়া উঠিয়াছিল। সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাংক সরকারের মহাজনও হইতে পারে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা : শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রথার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। (১) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাংকগুলি মূলধন যোগায় এবং এইভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। আবার স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাংকগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যে সাহায্য করে। (২) পাইকারী বিক্রেতাদের অনেক সময় নগদ টাকার দরকার হয়। কিন্তু তাহারা খুব কম সময়েই নগদ দামে তাহাদের জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। এই অবস্থায় বিল ডিস্কাউন্ট করিবার উপায় থাকায় তাহারা ব্যাংকের নিকট হইতে ব্যবসায়কার্যে সাহায্য পায়। পাইকারদের নিকট হইতে যাহারা জিনিস কেনে তাহারাও অনেক সময় নগদ দাম দিতে পারে না ; জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া পরে দাম দিতে পারে। বিল প্রথা চালু হাওয়ায় তাহারাও সাহায্য পায়। মোটের উপর বলা যায় যে ব্যাংক থাকায় কেনা-বেচার কার্য সহজ হয় এবং বেশী কেনাবেচার সুযোগ হয়।

ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা : (১) উৎপাদনে ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে সাহায্য করে ; (২) ব্যবসায় কার্যে সাহায্য করে ;

(৩) ব্যাংকগুলি গচ্ছিত ধন আমানত রাখিয়া যেমন লোকের সঞ্চয়ের সুবিধা করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সহজ করিয়া দেয় তেমনি আবার লগ্নী কারবার করিয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ইহার চেয়েও বড় দান করে। এই লগ্নী কারবারের ফলে প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যায়, উৎপাদনকার্য উন্নতি লাভ করে। ইহার ফলে ক্রয়-বিক্রয় কার্যও বাড়িয়া চলে।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে

ব্যাংকের প্রধান কার্য জমা রাখা এবং ধার দেওয়া হইলেও অনেক ব্যাংক অন্যান্য কিছু কাজও করে। ব্যাংক অনেক সময়ে কিছু কমিশন লইয়া লোকের জন্য শেয়ার ক্রয় অথবা বিক্রয় করে। অনেক সময়ে ব্যাংক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও নেয়।

ব্যাংকের অন্যান্য কাজ

আস্থাপত্র (Credit Instruments)—যে লোকের কোন ব্যাংকে

(সাধারণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকে) কিছু আমানত আছে সে সেই ব্যাংকে চেক কাটিয়া আমানতী টাকা তুলিতে পারে। ব্যাংক আমানত রাখিয়া আমানতকারীকে চেক বই দেয়। আমানতকারী একটি চেক দিয়া ব্যাংককে নির্দেশ দেয় যে, অমুক লোককে অথবা সেই লোক যাহার কথা বলে তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দেওয়া হউক। ব্যাংক সেই অনুসারে কাজ করে।

আস্থাপত্র কাহাকে বলে এবং কেন

ধরা যাক, কলিকাতার কোন ব্যাংকে একজনের ২০০০০৲ আমানত আছে। এক ফার্নিচারের দোকান হইতে সে হয়তো ১০০০৲ টাকার ফার্নিচার কিনিল। দোকানদারকে নগদ টাকা না দিয়া সে ঐ ব্যাংকের উপর একখানি ১০০০৲ টাকার চেক কাটিয়া দিল। চেকে নির্দেশ রহিল যে ঐ দোকানকে (চেকে দোকানের নাম সঠিক লিখিয়া দিতে হইবে) অথবা ঐ দোকান যাহার কথা বলে তাহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে দোকানদার ভারত সরকারের মুদ্রাংকিত টাকার (যাহা সে লইতে অস্বীকার করিতে পারে না) পরিবর্তে চেক নিতে রাজি হইল কেন? সাধারণতঃ পাওনাদার বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া চেক লইতে রাজি হয়। প্রথমতঃ দেনাদারের উপর তাহার এই আস্থা থাকে যে তাহার দেয় অর্থ ব্যাংকটিতে আমানত আছে; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংকটির উপরও তাহার এই আস্থা যে ইহার ঐ অর্থদানের ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে ফার্নিচারের ঐ দোকান আইনতঃ চেক লইতে বাধ্য নহে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে যে ব্যাংকটিতে ক্রেতার অন্ততঃ এক হাজার টাকা আমানত আছে এবং ব্যাংকটিরও ঐ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এইরূপ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই চেকের দ্বারা জিনিস কেনার কাজ চলিল। এইজন্য চেককে আস্থাপত্র (Credit Instrument) বলে।

উদাহরণ

চেক ছাড়া আরও অনেক রকমের আস্থাপত্র আছে। যেমন, ব্যাংক নোট, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিল ইত্যাদি। নিম্নে সেগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া হইল।

ব্যাংক নোট—কিছুকাল পূর্বে অনেক দেশেই সাধারণ ব্যাংকগুলি নিজেরাই নোট ছাপাইয়া বাজারে চালাইত। এই নোট ছিল এক ধরণের প্রতিশ্রুতিপত্র। এই নোট যে ব্যাংক তৈয়ারী করিত সে প্রতিশ্রুতি দিত যে চাহিবামাত্র নোটের পরিবর্তে সরকারী মুদ্রাংকিত অর্থ দিবে। ব্যাংকের এই

রকম প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিত বলিয়াই লোকে ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। তবে আজকাল সাধারণতঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত অন্য ব্যাংক নোট ছাপায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাহির করে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (যাহার নাম রিজার্ভ ব্যাংক) দুই এবং তদূর্ধ্ব টাকার নোট ছাপায় এবং বাজারে ছাড়ে। এই নোটগুলিতে লেখা থাকে যে চাহিবামাত্র ব্যাংক নোটের বাহককে সরকারী মুদ্রাংকিত টাকা (এক টাকার ধাতব মুদ্রা বা নোট) দিবে। কোন কোন দেশে হয়ত পাওনাদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য। সেক্ষেত্রে সেই ব্যাংক-নোটকে আস্থাপত্র বলিব না, সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলেও অর্থ বলিব।

ব্যাংক নোট

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল (Internal Trade Bill), **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিল** (Bill of Exchange) ঃ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধারে বিক্রয়ের পদ্ধতি (credit system) প্রসার লাভ করার ফলে আজকাল ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানকালে ধারে বিক্রয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শুধু দেশের মধ্যেই নহে, এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্যও এইভাবে চলে। ইহার আসল কথা হইল এই যে লোকে একটি নির্দিষ্ট সময় (সাধারণতঃ দুই তিন মাস) পার হওয়া মাত্র দাম দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জিনিসপত্র কেনে। ব্যবসায়ীগণ বিল স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞাটি পাকাপোক্ত করিয়া লয়।

একই দেশের অধিবাসী দেনাদার এবং পাওনাদার সেই দেশের সরকারী মুদ্রায় দেনাপাওনা মিটাইতে রাজি হইয়া যে বিল তৈয়ারী করে তাহাকে বলা হয় **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল** (Internal Trade Bill), আর দুই বিভিন্ন দেশের অধিবাসী দেনাদার ও পাওনাদার নির্দিষ্ট একটি দেশের সরকারী মুদ্রায় দেনা-পাওনা মিটাইতে রাজি হইয়া বিল তৈয়ারী করিলে সেই বিলকে বলা হয় **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিল** (Bill of Exchange)।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিল

আস্থাপত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিলে বলা যায় যে যদিও পাওনাদার ইহা গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নয় (ইহা কেবল পাওনাদারের আস্থার উপরই

চলে) তথাপি ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক সময়েই এই আস্থাপত্রের সাহায্যেই পাওনাদারের হিসাব মিটানো হয় বলিয়া আস্থাপত্রগুলি অর্থের একটি বিশিষ্ট কাজ করে—ইহারা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থ (Bank Money)—এখন প্রশ্ন হইতে পারে, চেক কি অর্থ (Is cheque money ?)। সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলে যদিও চেককে অর্থ বলা যায় না, তবে একটু ব্যাপকভাবে দেখিলে—ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে বিচার করিলে—চেককেও অর্থের সমতুল্য বলা যায়।

চেক কি অর্থ ?

একটি ব্যাংকে যে পরিমাণ সরকারী মুদ্রাংকিত অর্থ আমানত করা হইয়াছে সেই ব্যাংকের মোট আমানত যদি তাহার চেয়ে বেশী না হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ব্যাংক চেক কাটার অধিকার দান করিয়া অর্থ কিংবা অর্থতুল্য জিনিসের পরিমাণ বাড়ায় নাই। তবে বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাংক যাহাকে ধার দেয় তাহাকে সোজাসুজি সরকারী মুদ্রাংকিত অর্থ নগদ না দিয়া তাহার নামে একটি আমানতের হিসাব খোলে। খাতক আমানতকারীতে পরিণত হইয়া চেক বই পাইল। সে প্রয়োজন মত চেক কাটিয়া টাকা তুলিবে। এখন, যে চেকগুলি টাকার কাজ চালাইল সেগুলি ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট আমানতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, সরকারী মুদ্রাংকিত অর্থের নয়। ব্যাংক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিয়াছে, সেই আমানতের দাবীতে অর্থতুল্য জিনিসের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বলিতে পারি ব্যাংকই অর্থতুল্য জিনিস সৃষ্টি করিল। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক প্রথা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ব্যাংকগুলি কর্জের ভিত্তিতে আমানত সৃষ্টি করিয়া বহু পরিমাণ চেক কাটিবার অধিকার তৈয়ারী করে। কর্জমূলক আমানত সাধারণতঃ সরকারী মুদ্রাংকিত অর্থের ভিত্তিতে গঠিত আমানতের কয়েকগুণ বেশী হয়। তাই কর্জমূলক আমানতকে অনেক সময়ে ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থ (Bank Money) বলা হয়।

কর্জমূলক আমানতকে ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থ বলে

অর্থ সৃষ্টি (Creation of Money)—সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলে অর্থনীতিতে যাহাকে অর্থ বলা হয় তাহা সৃষ্টি করে সরকার ; যেমন আমাদের দেশে টাকা তৈয়ারী করে ভারত সরকার, জনসাধারণের টাকা তৈয়ারী করার অধিকার নাই। সুতরাং সরকার মোটামুটিভাবে দামের স্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নোট

দেশে অর্থ সৃষ্টি হয় কিভাবে

ছাপায়, যথেচ্ছভাবে নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতির কুফল ডাকিয়া আনে না। তবে ব্যাপকভাবে যদি বলা যায় যে যাহা অর্থের কোন কোন কাজ করে তাহাই অর্থ, তাহা হইলে বলা যাইবে যে ব্যাংকগুলি কর্জের ভিত্তিতে গঠিত আমানত এবং ব্যবসায়িগণ বিল ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

প্রশ্নাবলী

১। ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি? ব্যাংক প্রথার ফলে আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনে কি কি সুবিধা হইয়াছে বুঝাইয়া দাও।

(What are the functions of banks? How does the banking system help the economic life of the community?)

[পৃঃ ৫৮-৫৯, ৬১ দেখ]

২। কমার্শিয়াল ব্যাংক কি ভাবে ধার দেয়? **(How does a commercial bank lend money?)** [পৃঃ ৫৯-৬১ দেখ]

৩। আস্থাপত্র কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(Explain, with illustrations, what you mean by credit instruments.)

[পৃঃ ৬১-৬৪ দেখ]

৪। ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থ বলিলে কি বুঝা যায়? **(What do you mean by bank money?)** [পৃঃ ৬৪ দেখ]

৫। অর্থের সৃষ্টি কি কি ভাবে হয় বুঝাইয়া দাও। **(In what ways is money created?)** [পৃঃ ৬৪-৬৫ দেখ]

চাহিদা ঃ যোগান ঃ মূল্য

(Demand : Supply : Price)

উপযোগ ও চাহিদা (Demand and Utility) ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্থবিদ্যায় উপযোগ শব্দের অর্থ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। মানুষের কোন অভাববোধ জাগিলে সেই অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্য মানুষ পাইতে চায়। কিন্তু কেবল এই পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই যে চাহিদা (demand) সৃষ্টি হইল তাহা বলা চলে না। আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দ্রব্যটি পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে তবেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটির চাহিদা হইবে। আকাঙ্ক্ষা চাহিদার মূলে থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা চাহিদা নয়। **উপযোগ-বিশিষ্ট কোন দ্রব্য পাইতে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা ঈপ্সিত দ্রব্যের চাহিদা** (demand) সৃষ্টি করে।

চাহিদা সৃষ্টি হয় কিভাবে

উপযোগ হ্রাসের সূত্র (Law of Diminishing Utility) ঃ কোন ব্যক্তি যদি একই দ্রব্য ক্রমাগত পায় বা ভোগ করে তবে স্বাভাবিক অবস্থায় (রুচি, অভাব, আয় প্রভৃতি পরিবর্তিত না হইলে) সে ব্যক্তির নিকট সে দ্রব্যের উপযোগ ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং তাহার চাহিদাও কমিয়া আসে। এ সূত্রকে অর্থবিদ্যায় **উপযোগ হ্রাসের সূত্র বা Law of Diminishing Utility** বলা হয়।

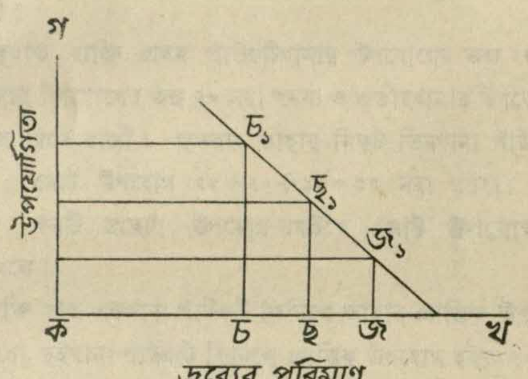
একই দ্রব্যের ক্রমাগত প্রাপ্তি বা ভোগে ঐ দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পায়

মনে করা যাক, কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রথমে হয়ত একখানা পাঁউরুটির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করিল। প্রথম পাঁউরুটিখানা পাইবার পর দ্বিতীয়খানার জন্য আকাঙ্ক্ষা তাহার কমে এবং ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসে যে সে আর পাঁউরুটির জন্য আকাঙ্ক্ষাই বোধ করে না। ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষা হ্রাসের কারণ— প্রথমখানার পর প্রত্যেকখানা পাঁউরুটির ক্রমান্বয়ে উপযোগ হ্রাস। উপযোগ হ্রাস হইতে আকাঙ্ক্ষা হ্রাস বা ক্রয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়। মনে করা যাক, প্রথম পাঁউরুটিখানার জন্য ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হয়ত ২৫ নয়া পয়সা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল, দ্বিতীয়খানার জন্য ২০ নয়া পয়সা

উদাহরণ

৬৭ পৃষ্ঠার

ক্রমহ্রাসমান উপযোগের সূত্র সম্পর্কে রেখাচিত্র



ধরা যাক **কখ** রেখা দ্রব্যের পরিমাণ ও কগ রেখা প্রতি একক দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা নির্দেশ করিতেছে। ধরা যাক, ভোগকারী **কচ** এককের জন্য **চচ১**, **ছচ** এককের জন্য **ছছ১** এবং **ছজ** এককের জন্য **জজ১** দাম দিতে প্রস্তুত। **চ১ছ১জ১** বিন্দুগুলি যোগ করিয়া **চ১ছ১জ১** রেখা পাওয়া গেল। এই রেখাটি নিম্নাভিমুখী। ইহাই ক্রমহ্রাসমান উপযোগের রেখা।

দিতে কিন্তু তৃতীয় খানার জন্য সে হয়ত ১২ নয়া পয়সার বেশী দিতে প্রস্তুত ছিল না। এখানে ২৫ নয়া পয়সা, ২০ নয়া পয়সা, ১২ নয়া পয়সা হইল ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটির নিকট এক একখানি পাঁউরুটির ক্রমহ্রাসমান উপযোগের পরিমাণ।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ (Marginal Utility and Total Utility) ঃ

উপরোক্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রথম পাঁউরুটিখানার উপযোগের জন্য ২৫ নয়া পয়সা, দ্বিতীয়খানার উপযোগের জন্য ২০ নয়া পয়সা ও তৃতীয়খানার উপযোগের জন্য ১২ নয়া পয়সা দিতে রাজী। সুতরাং তাহার নিকট তিনখানা পাঁউরুটির মোট উপযোগ ২৫+২০+১২=৫৭ নয়া পয়সা। সব কয়টি দ্রব্যের উপযোগ-সমষ্টিকে **মোট উপযোগ বা Total Utility** বলে।

মোট উপযোগ

ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মাত্র একখানা পাঁউরুটি কিনিলে তাহার প্রান্তিক উপযোগ হইত ২৫ নয়া পয়সা, দুইখানা-পাঁউরুটি কিনিলে প্রান্তিক উপযোগ হইত ২০ নয়া পয়সা এবং তিনখানা পাঁউরুটি কিনিলে প্রান্তিক উপযোগ হইতে ১২ নয়া পয়সা।

কোন ক্রেতা একটি দ্রব্য বেশী বা কম কিনিলে মোট উপযোগ যতটুকু বাড়ে বা কমে তাহাই তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের **প্রান্তিক উপযোগ** বা **Marginal Utility**।

প্রান্তিক উপযোগ

অতএব মোট উপযোগ=দ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি।

চাহিদা সর্বদাই মূল্যের উপর নির্ভর করে। চাহিদা বলিতে সব সময়ই কোন নির্দিষ্ট মূল্যে চাহিদা (Demand at a price) বুঝায়।

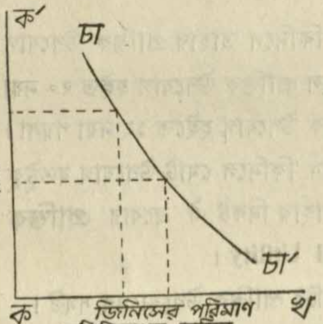
উপরোক্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তির নিকট তৃতীয় পাঁউরুটিখানার প্রান্তিক উপযোগ ১২ নয়া পয়সা। পাঁউরুটির দাম বাজারে ১২ নয়া পয়সা হইলেই সে তিনখানা পাঁউরুটি কিনিবে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের সমান হইয়া থাকে।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) ঃ দাম কমিলে লোকে বেশী জিনিস কেনে এবং দাম বাড়িলে লোকে কম জিনিস কেনে ঃ অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমে এবং মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা বাড়ে। ইহাই চাহিদার নিয়ম। (পূর্বের উদাহরণে দেখিয়াছ যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি ২৫ নয়া পয়সা দরে একখানা, ২০ নয়া পয়সা দরে দুইখানা ও ১২ নয়া পয়সা দরে তিনখানা পাঁউরুটি কেনে।)

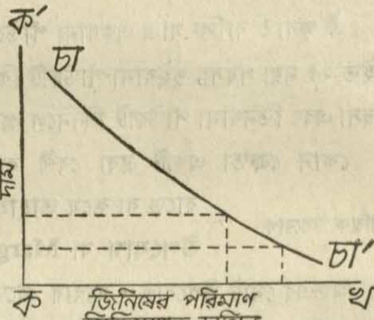
চাহিদার নিয়ম : কম দাম চাহিদা বেশী, বেশী দাম চাহিদা কম

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) : কিন্তু চাহিদার নিয়ম সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নহে। দামের পরিবর্তনের সংগে চাহিদার পরিবর্তনের সম্বন্ধকে **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা Elasticity of demand** বলে। কোন কোন দ্রব্যের দাম সামান্য বাড়িলেই চাহিদা আর থাকে না (অর্থাৎ কেউ সে জিনিস আর কেনে না)। এ সকল দ্রব্যের চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা perfectly elastic। কোন কোন জিনিসের দাম সামান্য বাড়িলেই চাহিদাও বেশ কমিয়া যায়, অথবা দাম সামান্য কমিলেই চাহিদা অনেকখানি বাড়ে। এ জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা elastic। এইজন্যই বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও স্থিতিস্থাপক। কোন দ্রব্যের

অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ও বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক



অস্থিতিস্থাপক চাহিদা



স্থিতিস্থাপক চাহিদা

পরিবর্তে সহজেই অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা গেলে দুইটি দ্রব্যের চাহিদাই স্থিতিস্থাপক হয়। কোন কোন জিনিসের দাম সামান্য বাড়িলে চাহিদা বিশেষ কমে না বা দাম সামান্য কমিলেও চাহিদা তেমন বাড়ে না। এ জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বা inelastic। অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের (চাউল, গম প্রভৃতি) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক

দামের হ্রাস-বৃদ্ধির সংগে চাহিদার বাড়া বা কমাকে **মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা** বা price-elasticity of demand বলে।

ব্যক্তির বা সমাজের আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধিকে **আয়গত স্থিতিস্থাপকতা** বা income-elasticity of demand বলে।

যোগান (Supply) ও যোগানের নিয়ম (Law of Supply) :

যোগান বলিতে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দরে বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণে বাজারে উপস্থিত থাকে তাহাকে বুঝায়। দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে ও দাম কমিলে যোগান কমে। কারণ, দাম বাড়িলে ব্যবসায়ীদের চড়া দামে বিক্রয় করার উৎসাহ বাড়ে এবং দাম কমিলে কমতি দামে বিক্রয় করার উৎসাহ কমে।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনিরূপণ (Price determination under Competition) ঃ

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বলিতে বুঝিতে হইবে যে বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে এবং বিক্রেতারা সকলে একই জিনিস বিক্রয় করে এবং ক্রেতারা জানে কী দামে জিনিসটি বেচা-কেনা হয়।

যখন বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনার জন্য প্রতিযোগিতা করে তখনই বাজারে কোন জিনিসের **একটিমাত্র দর** স্থিরীকৃত হয়। জিনিসের যোগান ও চাহিদা দ্বারা তাহার দর স্থিরীকৃত হয়। ক্রেতারা বিভিন্ন দরে বিভিন্ন পরিমাণ জিনিস কিনিতে চায় এবং দাম যত কমে চাহিদা তত বাড়ে। বিক্রেতারাও বিভিন্ন দরে বিভিন্ন পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিতে চায় এবং দাম যত কমে যোগানও তত কমে অর্থাৎ বিক্রেতারা কম জিনিস বিক্রয় করিতে চায়। এভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

স্থিতমূল্যই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজার দর

যে দরে ক্রেতারা যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে চায় সে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতারাও সে দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলে (অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান সমান হইলে) সে দরকে **স্থিতমূল্য বা** Equilibrium Price বলা হয় এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহাই বাজার দর।

উপরোক্ত সূত্রের একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক্ ঃ

(ক) কোন এক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জিনিস বিভিন্ন দরে যে পরিমাণ কিনিতে চাহে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা (Individual Demand Schedule) ঃ

ক্রীত পাঁউরুটির সংখ্যা	দাম
১	২৫ নঃ পঃ
২	২০ নঃ পঃ
৩	১২ নঃ পঃ
৪	৮ নঃ পঃ

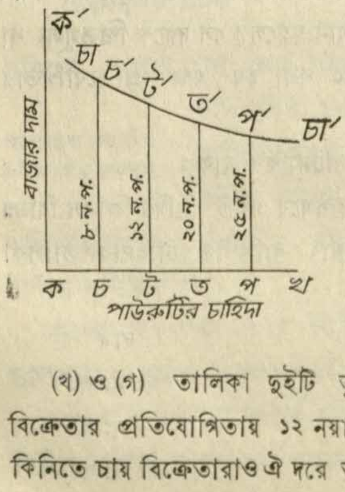
(খ) বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জিনিস বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ কিনিতে চাহে অর্থাৎ সামগ্রিক বা বাজারের চাহিদার তালিকা (Market Demand Schedule) :

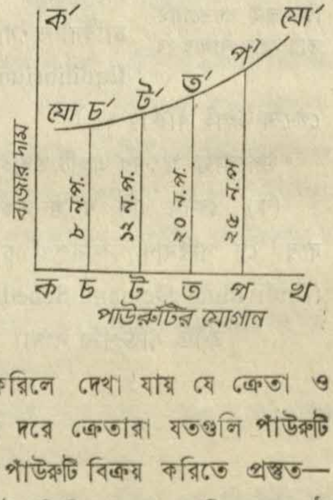
বিক্রীত পাঁউরুটির সংখ্যা	দাম
১০০০	২৫ নঃ পঃ
২০০০	২০ নঃ পঃ
৩০০০	১২ নঃ পঃ
৪০০০	৮ নঃ পঃ

এই দুই তালিকাই চাহিদার দিকের। দেখা যাইতেছে দর কমিলে চাহিদা বাড়িতেছে।

(গ) সামগ্রিক বা বাজারের যোগানের (একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রেতা কী পরিমাণ বিক্রয় করিতে চাহে) তালিকা :

দাম	বিক্রেয় পাঁউরুটির সংখ্যা
২৫ নঃ পঃ	৬০০০
২০ নঃ পঃ	৪০০০
১২ নঃ পঃ	৩০০০
৮ নঃ পঃ	২০০০



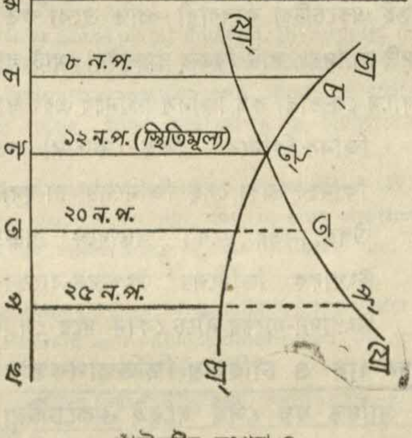


(খ) ও (গ) তালিকা দুইটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতায় ১২ নয়া পয়সা দরে ক্রেতারা যতগুলি পাঁউরুটি কিনিতে চায় বিক্রেতারাও ঐ দরে ততগুলি পাঁউরুটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—ক্রেতারা ১২ নয়া পয়সা দরে ৩০০০ পাঁউরুটি কিনিতে চায় ও বিক্রেতারা ঐ

দরে ৩০০০ পাঁউরুটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এই দরে সব বিক্রেতাই ক্রেতা পাইবে এবং প্রত্যেক ক্রেতাই যাহার যে পরিমাণ ইচ্ছা কিনিতে পারিবে। অতএব ১২ নয়া পয়সা স্থিতমূল্য বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাজার দর।

উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য (Cost of Production and Value) : উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, মূলধনের জন্য সুদ, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও লাভ—এই সমস্ত খাতে যাহা খরচ হয় তাহাই কোন জিনিসের **উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)**। উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বাজার দর কম হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতার ক্ষতি হয়। উৎপাদক যদি দেখে যে বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম তবে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। ফলে, চাহিদা সমান থাকিলেও যোগান কমিয়া যাইবে। সে অবস্থায় বাজার দর বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। অতএব দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করিলে বাজার দর ও উৎপাদন ব্যয় সমান হইবার সম্ভাবনা।

দীর্ঘমেয়াদী বাজারে বাজার দর ও উৎপাদন ব্যয় সমান



পাঁউরুটির সংখ্যা ও
স্থিতমূল্য

দীর্ঘকাল পরেও যে দর ঠিক থাকে তাহাকে **স্বাভাবিক মূল্য (Normal value)** বলা হয়। স্বাভাবিক মূল্য গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়।

অল্প সময়ের কথা বিচার করিলে মূল্য নিরূপণে চাহিদার প্রভাব অধিকতর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যে যোগান বাড়ান (উৎপাদন বাড়াইয়া বা আমদানি বাড়াইয়া) সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে মূল্য নিরূপণে যোগানের প্রভাব অধিক এবং জিনিসের মূল্য গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়।

একচেটিয়া কারবারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ (Price determination under Monopoly)ঃ কোন দ্রব্যের উৎপাদক বা বিক্রেতা মাত্র একজন বা অল্প কয়েকজন হইলে সে দ্রব্যের কারবারকে **একচেটিয়া কারবার (Monopoly business)** বলে। কয়েকজন ব্যবসায়ী একত্র হইয়া বা রাষ্ট্রের সনদ লইয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে

একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছামত জিনিসের উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে পারে এবং ইচ্ছামত দর ঠিক করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগান অনুসারে একচেটিয়া কারবারে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। ক্রেতা কিনিতে অসমর্থ বা অস্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত দাম বাড়াইয়া একচেটিয়া কারবারী মুনাফা করিতে চেষ্টা করিতে পারে।

কিন্তু স্বভাবতই একচেটিয়া কারবারী প্রতি দ্রব্যে কত বেশী লাভ করিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া মোট বিক্রয় বাড়াইয়া মোট লাভ বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। খুব উচ্চ দামে ক্রেতারা কম জিনিস কিনিবে এবং দাম কম হইলে বেশী জিনিস কিনিবে। কিন্তু ক্রেতারা কত পরিমাণ জিনিস কিনিবে তাহা সেই জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে বিক্রয় বাড়াইতে গিয়া উৎপাদক জিনিসের উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাব করিবে। উৎপাদন-ব্যয়ের নীচে কোন দরে সে বিক্রয় করিবে না। সুতরাং **উৎপাদন-ব্যয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সামঞ্জস্য যে দরে সবচেয়ে বেশী সাধিত হয় সেই দরেই একচেটিয়া কারবারী জিনিস বিক্রয় করে।**

একচেটিয়া কারবারী চায় উৎপাদন-ব্যয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সামঞ্জস্য

মনে করা যাক্ একজন একচেটিয়া কারবারী ২০০টি জিনিস ২০০৲ টাকায় উৎপাদন করিয়া (অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের উৎপাদন ব্যয় ১৲) ৪০০৲ (প্রতি জিনিসের দর ২৲) টাকায় বিক্রয় করিয়া ২০০৲ লাভ করিতেছে। সে উৎপাদন

বাড়াইয়া ৩০০টি জিনিস উৎপাদন করিল। তাহার মোট উৎপাদন-ব্যয় হইল ৩৫০৲ অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল টা. ১·১৭—এক টাকা সতর নয়া পয়সা। অপর দিকে, ২৲ দরে ২০০টি মাত্র জিনিসের চাহিদা আছে। তাই ৩০০টি জিনিসের ক্রেতা পাইতে হইলে (চাহিদা বাড়াইতে হইলে) দাম কমাইতে হইবে। তখন সেই কারবারী প্রতি জিনিসের দর ঠিক করিল টা. ১·৯০—এক টাকা নব্বই নয়া পয়সা। ইহার ফলে তাহার লাভের পরিমাণ দাঁড়াইবে—২২০৲ (বিক্রয় দর ৫৭০৲—উৎপাদন ব্যয় ৩৫০৲=লাভ ২২০৲)।

উদাহরণ

উৎপাদন বাড়াইয়া কারবারীর লাভ বাড়িল। তাই সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিবে। এইভাবে চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে যে যে দামে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (marginal cost of production) ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ (marginal revenue) সমান হইবে সেই দামে কারবারী সর্বাধিক লাভ করিতেছে। সুতরাং কারবারী সেই দামেই জিনিস বিক্রয় করিবে এবং তাহাই হইবে একচেটিয়া দাম (monopoly price)।

প্রশ্নাবলী

১। (ক) চাহিদা, (খ) যোগান, (গ) প্রান্তিক উপযোগ (ঘ) মোট উপযোগ ও (ঙ) উৎপাদন-ব্যয় বলিতে কি বোঝ?
(Write short notes on (a) demand, (b) supply, (c) marginal utility, (d) total utility and (e) cost of production.) [পৃঃ ৬৬, ৬৭, ৭১ দেখ]

২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে? মূল্যগত ও আয়গত স্থিতিস্থাপকতা কী? অত্যাবশ্যক দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কেন?
(What is meant by 'elasticity' of demand? What do you understand by price elasticity and income elasticity? Why is the demand for necessaries of life inelastic and that for luxuries elastic?) [পৃঃ ৬৮ দেখ]

৩। (ক) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এবং (খ) একচেটিয়া কারবারে কীভাবে মূল্য নিরূপিত হয় বুঝাইয়া দাও। (Explain how value is determined (a) under perfect competition and (b) monopoly.) [পৃঃ ৬৯-৭৩ দেখ]

৪। "চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মূল্য নিরূপিত হয়"—এ সূত্র উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।
("Value is determined by the interaction of demand and supply." Explain and illustrate.) [পৃঃ ৬৯-৭১ দেখ]

৫। উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্যের সম্পর্ক নির্দেশ কর।
(What is the relation between cost of production and value?) [পৃঃ ৭১-৭২ দেখ]

খাজনা

(Rent)

জাতীয় আয় ও বণ্টনতত্ত্ব : আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা ভোগ, উৎপাদন, উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত আলোচনা প্রসংগে ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে কোন দেশের জাতীয় আয় সেই দেশের উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জমির মালিকের খাজনা, শ্রমিকের মজুরী, পুঁজিপতির সুদ এবং ব্যবসায়ের মালিকের লাভের সমষ্টি লইয়াই কোন দেশের জাতীয় আয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয় উৎপাদনের চারিটি উপাদান—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মধ্যেই বণ্টিত হয়।

জাতীয় আয় নির্ভর করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সহযোগিতার উপর

উৎপাদনে এই চারিটি উপাদানের সহযোগিতা অপরিহার্য। এই চারিটি উপাদানের সহযোগিতার মূল্য নির্ধারণের তত্ত্বকে অর্থনীতিতে বলা হয় **বণ্টনতত্ত্ব** (Theory of Distribution)। বণ্টনতত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় যে উৎপাদিত জিনিসের দাম যেভাবে নিরূপিত হয় সেই ভাবেই যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারাই উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের প্রত্যেকটিরই উৎপাদন ব্যাপারে সহযোগিতার মূল্য নির্ধারিত হয়। এবার আমরা বিস্তারিতভাবে এবিষয়ে আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই বলি জমির খাজনার কথা।

বণ্টনতত্ত্ব

খাজনা : অর্থবিদ্যায় **খাজনা** বলিতে **কোন প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে তাহার মালিক যে আয় পায় তাহা বুঝায়।** "জমির উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ জমির মৌলিক ও চিরস্থায়ী গুণের জন্য মালিককে দিতে হয় তাহাই খাজনা"—খাজনার সংজ্ঞা এইভাবে ইংরেজ অর্থবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

খাজনা কাহাকে বলে

জমি প্রকৃতির দান। তবুও জমির মালিক যে খাজনা পায় তাহার কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। আবার সব জমি সমান উর্বরাও নয়। উর্বরা জমির

চাহিদাও বেশী। সহরে ও শিল্পাঞ্চলে বাড়ী বা কারখানা করার জমির চাহিদা খুব, কিন্তু ঐরূপ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। জমি উৎপাদন-হ্রাসের সূত্রাধীন এবং জমিতে ফসল বাড়াইতে গেলে উৎপাদনের খরচ বাড়ে। তাই ফসল বাড়াইতে চাষী নূতন জমি চায়।—এ সমস্ত কারণে চাহিদার তুলনায় জমি অপ্রচুর বলিয়া জমির মালিক প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারে এবং চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে ও অবস্থায় খাজনার হারের তারতম্য হয়।

খাজনা নির্ধারণ (Determination of Rent) ঃ

রিকার্ডোর মত (Ricardian theory of Rent) ঃ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর খাজনার সংজ্ঞা পূর্বেই জানিয়াছ। তাঁহার মতে, উর্বরতা জমির একটি মৌলিক ও চিরস্থায়ী গুণ। একখণ্ড জমি অপর একখণ্ড জমি অপেক্ষা উর্বর ঃ সেকারণে সে জমিতে বেশী ফসল ফলে এবং উর্বরতার জন্য প্রাপ্ত অধিক ফসলের একাংশ চাষী জমিদারকে খাজনা দেয়।

মনে করা যাক, এক জনহীন দ্বীপে একদল চাষী বসতি স্থাপন করিয়া চাষ সুরু করিল। স্বভাবতই তাহারা সর্বাপেক্ষা উর্বরা জমি চাষ করিতে সুরু করিবে এবং যার যতটা খুশী জমি চাষ করিবে। সেখানে তখন চাহিদার তুলনায় জমির পরিমাণ অপ্রচুর নয় এবং জমির মালিকও কেহ নাই। সুতরাং তখন কেহ কাহাকেও খাজনা দিবে না।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব

ক্রমে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি হেতু আরও জমি চাষ করা প্রয়োজন হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি (প্রথম যে জমিতে চাষ সুরু হইয়াছিল তাহা হইতে কম উর্বর) চাষ করা সুরু হইল। তখন দেখা যাইবে যে ফসল উৎপাদনে সমান খরচ করিয়াও প্রথম শ্রেণীর জমিতে যত ফসল হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে তাহা অপেক্ষা কম হয়। সমপরিমাণ জমিতে সমান খরচ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে যাহা উৎপন্ন হইল তাহার বাজার দর হইল ৫০৲ টাকা, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দর হইল ৪০৲ টাকা। মনে করা যাক, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের খরচ (চাষীর লাভ ধরিয়া) পড়িয়াছিল ৪০৲ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রথম শ্রেণীর জমির চাষী ফসল বেচিয়া (৫০৲ − ৪০৲ = ১০৲) দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষী অপেক্ষা ১০৲ টাকা বেশী আয় করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষী কেবল তাহার খরচই উঠাইতে পারিল। প্রথম শ্রেণীর জমির চাষীর এই উদ্বৃত্তই তাহার জমির

খাজনা। কোন জমিদার না থাকিলে চাষীকে এ খাজনা দিতে হয় না। কিন্তু কোন জমিদার থাকিলে অন্যান্য চাষীদের সংগে প্রতিযোগিতায় চাষীকে এই পরিমাণ খাজনা জমিদারকে দিতে হয়।

প্রান্তিক জমি

উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে চাষীর পারিশ্রমিক বা লাভ ধরিয়া যে জমিতে উৎপন্ন ফসলের বাজার দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয় তাহাকে **প্রান্তিক জমি** বা **Marginal land** বলা হয়। প্রান্তিক জমিতে উৎপন্ন ফসল ও ভাল জমির ফসলের পার্থক্যই ভাল জমির খাজনা।

রিকার্ডোর মতের সমালোচনা :

(১) রিকার্ডো যে বলিয়াছেন যে উর্বরতা জমির একটি মৌলিক ও চিরস্থায়ী গুণ তাহা সত্য নহে। কেননা দেখা গিয়াছে যে জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অধীন ; তাহা ছাড়া মানুষ নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে পারে।

(২) খাজনা সচরাচর তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(ক) ফসলের জন্য চাহিদার বৃদ্ধি, (খ) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি এবং (গ) উর্বরা জমির অপ্রাচুর্য। কোন উর্বরা জমির ফসল হইতে প্রান্তিক জমির ফসলের বিয়োগফল দ্বারাই জমির খাজনা নির্ধারণ করা যায় না।

(৩) প্রান্তিক জমির খাজনা নাই, ইহাও ঠিক নহে। কারণ একটা জমিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ফসল কম হইলেও অন্য কোন ভাবে ব্যবহার করিয়া ঐ নিকৃষ্ট জমি হইতেও আয় পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় যে প্রতিযোগিতার জন্য প্রান্তিক জমিরও খাজনা থাকে।

খাজনা ও দাম (Rent and Price) : উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে রিকার্ডোর মতে খাজনা জমির উর্বরতা ও ফসলের দামের উপর নির্ভর করে। উপরের উদাহরণে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ৪০৲ টাকা খরচ করিয়া ৪০৲ টাকার ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া সে জমির খাজনা নাই। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় ঠিক থাকিল, অথচ ফসলের দাম বাড়ার জন্য যদি সে-জমির ফসলের দাম ৪৫৲ টাকা হয় তখন সে জমির খাজনা হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। কিন্তু খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে না। খাজনা বেশী দিতে হইলেও কৃষককে বাজার দরেই তাহার ফসল বেচিতে হইবে। দাম বাজারের অবস্থার (চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের) উপর নির্ভরশীল।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাজনাবৃদ্ধির সম্বন্ধ (Growth of Population influences Rent) : জনসংখ্যা বাড়িলে খাজনা বাড়িবার সম্ভাবনা হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। সেই কারণে তখন ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির চাষ হইতে থাকে। ফলে সর্বশ্রেণীর জমিরই খাজনা হয়। তাছাড়া জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে ; ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে খাজনাও বাড়ে।

প্রশ্ন

১। খাজনা কী ? রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব আলোচনা কর।

(What is 'economic rent' ? Explain and criticize Ricardian theory of rent.) [পৃঃ ৭৪-৭৬ দেখ]

২। খাজনা ও দামের পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(Explain in brief the relation between rent and price)

[পৃঃ ৭৬ দেখ]

৩। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাজনাবৃদ্ধির সম্বন্ধ কি ? সংক্ষেপে আলোচনা কর। (What is the relation between growth of population and rent ? Discuss briefly.)

[পৃঃ ৭৭ দেখ]

মজুরী

(Wages)

মজুরী কাহাকে বলে ঃ

উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাকে **মজুরী** (**Wages**) বলে। শ্রমিক বলিতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকিবহনকারী ব্যবস্থাপক ছাড়া সকলকে বুঝায়। মজুরী সময় হিসাবে বা কাজ হিসাবে দেওয়া হয়। সময় হিসাবে মজুরী দিতে মালিক দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক মজুরী ঠিক করে। সময় হিসাবে প্রদত্ত মজুরীকে **সময় মজুরী** (Time Wages) এবং কাজের পরিমাণ অনুসারে প্রদত্ত মজুরীকে **কর্মানুগ মজুরী** (Piece rates) বলে।

মজুরী ঃ সময় মজুরী ও কর্মানুগ মজুরী

আর্থিক মজুরী ও সামগ্রিক মজুরী (**Money wages and Real wages**) : শ্রমিক মজুরী বাবদ যে পরিমাণ টাকা পায় তাহা তাহার **আর্থিক মজুরী** বা **Money wages** বা **Nominal wages** ; আর শ্রমিক তাহার মোট আয়ের বিনিময়ে যে সকল দ্রব্য কিনিতে পারে ও যে সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করে তাহার সমষ্টি তাহার **সামগ্রিক মজুরী বা** real wages। আর্থিক মজুরী টাকায় প্রকাশ করা হয় কিন্তু সামগ্রিক মজুরী ভোগ্য বস্তুতে প্রকাশ করা হয়।

আর্থিক মজুরী

সামগ্রিক মজুরী হিসাব করিতে শ্রমিকের কাজের স্থায়িত্ব, কাজের বিপদ, উপরি আয়ের সুযোগ এবং বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ভ্রমণের সুযোগ, অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি হিসাবে ধরিতে হয়। কাজ রাখার জন্য শ্রমিককে কোন খরচ করিতে হইলে তাহা তাহার মোট আয় হইতে বাদ দিতে হইবে।

সামগ্রিক মজুরী

সামগ্রিক মজুরী হিসাব করিতে জীবনধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্যস্তরও বিবেচ্য। মূল্যস্তর পূর্বাপেক্ষা বাড়িলেও মজুরী ঠিক থাকিলে সামগ্রিক মজুরী কমিল ও মূল্যস্তর কমিলেও মজুরী ঠিক থাকিলে সামগ্রিক মজুরী বাড়িল ধরিতে হইবে।

মজুরীর হারের তারতম্য (Differences in wages) : বিভিন্ন কাজে মজুরীর তারতম্যের প্রধান কারণ শ্রমিকের দক্ষতা। দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী মজুরী পায়।

(১) যে কাজে শারীরিক শ্রম ভিন্ন অন্য কোন কৌশল প্রয়োজন হয় না সে কাজের মজুরী যে কাজ শিক্ষানবীশ রূপে থাকিয়া সময় বা অর্থ অথবা সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিখিতে হয় সে কাজের মজুরী অপেক্ষা কম হয়।

(২) অস্থায়ী কাজের মজুরী স্থায়ী কাজের মজুরী অপেক্ষা বেশী হয়।

(৩) কোন কাজে উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে সে কাজের প্রাথমিক মজুরী যে কাজে কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই তাহার মজুরী অপেক্ষা কম হইতে পারে।

(৪) লোকে সাধারণতঃ যে কাজ অপছন্দ করে বা যে কাজ সমাজের চোখে হেয় সে কাজের মজুরী পছন্দসই ও সম্মানজনক কাজের মজুরী অপেক্ষা বেশী হয়।

মজুরীর হার নির্ধারণ (Determination of Wages) :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মজুরীর হার নির্ধারণের নীতি ছিল এই যে সপরিবারে জীবনধারণের উপযোগী মজুরী শ্রমিককে দেওয়া হইবে (Subsistence theory)।

মজুরীর হার নির্ধারণের বিভিন্ন নীতি

অপর এক নীতি অনুসারে, শ্রমিকের জীবনধারণের মান (Standard of living) বজায় থাকে এমন মজুরী নির্দিষ্ট করিতে হইবে

মজুরীর হার নির্ধারণের বিষয়ে আধুনিক মত এই যে শ্রমিকের কাজের মজুরী তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার (Marginal Productivity) উপর নির্ভর করে। কোন দ্রব্যের মূল্য যেমন তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, শ্রমিকের মজুরীও তেমনি তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে উৎপাদন যতটা বাড়ে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ। মনে করা যাক, একজন মালিক ২০০ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে ৪০০০০৲ টাকা মূল্যের জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। ২০১ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে যদি উৎপাদিত জিনিসের মূল্য হয় ৪০১০০৲ টাকা তবে ঐ (৪০১০০৲ − ৪০০০০৲ = ১০০৲) ১০০৲ ঐ নবনিযুক্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার মূল্য এবং ঐ শ্রমিকের মজুরী তাহার এই প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমান মূল্যের হইবে।

উদাহরণ

যদি শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার কম হয় তবে লাভের জন্য মালিক আরও শ্রমিক নিয়োগ করিবে। তখন শ্রমিকের চাহিদা বাড়ার ফলে মজুরী বাড়িবে। আর যদি মজুরী প্রান্তিক উৎপাদনের বেশী হয় তবে মালিক আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। তখন শ্রমিকের চাহিদা কমার ফলে মজুরী কমিবে। সুতরাং মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

কোন নির্দিষ্ট মজুরীর হারে যতজন শ্রমিক কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহাদের সমষ্টিই হইল শ্রমিকের যোগান। যোগান বাড়িলে মজুরী কমিবে ও যোগান কমিলে মজুরী বাড়িবে। সুতরাং বলা যায় যে শ্রমিকের মজুরীও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ট্রেড্ ইউনিয়ান (Trade Union) : প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা মজুরীর সীমা নির্ধারিত হইলেও মালিক অধিক লাভের জন্য শ্রমিককে সর্বদাই কম টাকা দিতে চায়। শিক্ষিত, ধনী ও সংঘবদ্ধ মালিকদের বিপক্ষে অশিক্ষিত, গরীব ও অসংহত শ্রমিকেরা দর কষাকষি করিয়া তাহাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে পারে না এবং তাহারা বঞ্চিত হয়।

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব

শ্রমিকদের দুর্বলতা বহু পরিমাণে দূর করা সম্ভব হয় যদি তাহারা সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে মালিকদের বিরুদ্ধে যদি তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াই করিতে পারে। আধুনিক শ্রমিকেরা নিজেদের প্রাপ্য মজুরী ও অন্যান্য সুখসুবিধা আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং এই প্রকার সংঘকে বলে শ্রমিকসংঘ **(Trade Union)**।

শ্রমিকসংঘ

শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইবার জন্য, তাহাদের কাজের উন্নতির জন্য ও তাহাদের প্রতি মালিকের অন্যায় কোন আচরণের প্রতিকারের জন্য মালিকদের সংগে একযোগে আলাপ-আলোচনা করে। এই আলাপ-আলোচনাকে ইংরাজীতে **Collective bargaining** বলে। আলাপ-আলোচনায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে শ্রমিকসংঘ ধর্মঘট (শ্রমিকদের একসংগে কাজ বন্ধ করা) করে ও এইভাবে তাহাদের দাবী পূরণে মালিকদের বাধ্য করে।

শ্রমিকসংঘের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা

তাছাড়া শ্রমিকদের যোগ্যতর ও দক্ষতর করিয়া তোলার জন্য শ্রমিকসংঘ

শ্রমিকদের সাধারণ লেখাপড়া শেখায় ও শিল্প-শিক্ষা দেয়। শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচারকার্য চালায় ও শ্রমকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে ও সাহায্য করে।

পারিশ্রমিক ও শ্রমের যোগান (Wages and Supply of Labour)

উপরের আলোচনায় শ্রমের যোগান কথাটা ব্যবহার করা হইয়াছে। এই যোগানেরও একটা মূল্য অর্থাৎ ন্যূনতম মান থাকিবেই। পারিশ্রমিকের হার যদি এই ন্যূনতম মানের নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে শ্রমের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে অর্থাৎ ঐ হারে আর শ্রমিক পাওয়া যাইবে না। আগেই বলা হইয়াছে, শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোকের মনে ধারণা ছিল যে উহার হার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর উপরে উঠিবে না। যদি নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা হইলে শ্রমিকরা তাহাদের পরিবার বাড়াইতে সাহসী হইবে। ফলে শ্রমিকের সরবরাহ বাড়িয়া গিয়া পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যাইবে এবং আবার উহা নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর পর্যায়ে নামিয়া আসিবে।

বর্তমানে অবশ্য এ ধারণা যে ঠিক নহে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অনুন্নত দেশগুলিতেই এইরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব। অর্থনীতির দিক হইতে যে সমস্ত দেশ উন্নত সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি উন্নত এবং লোকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে চায়। সুতরাং মজুরীর হার বাড়িলেই যে তাহারা পরিবার বৃদ্ধি করিবে ইহা ঠিক নয়। কারণ পরিবার-বৃদ্ধির অর্থই নানা দিক দিয়া ব্যয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধির ফল আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের হ্রাস। উন্নত দেশের শ্রমিকরা ইহা কোন অবস্থাতেই কামনা করিবে না। উন্নত দেশগুলিতে পারিশ্রমিকের সাধারণ হার (general level) জীবনযাত্রার নিম্নতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণের সময় বিশেষ বিশেষ শিল্পের উদ্যোক্তাদের আরও একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাঁহাদের দেখিতে হয় যে পারিশ্রমিকের হার যেন এমন হয় যাহাতে শ্রমিকগণ এই শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে না যায়। অন্যান্য শিল্পেও মজুরীর নিম্নতম হার প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারেই স্থির করা হয়। এ-সম্বন্ধে অবশ্য কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। তবে প্রচলিত হার অপেক্ষা মজুরী কমাইবার চেষ্টা করিলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রতিবাদ করিবে,

এমন কি স্ট্রাইকও হইতে পারে। ফলে ঐ হারে আর শ্রমিক পাওয়া যাইবে না।

তবে পারিশ্রমিকের হার নিম্নতম মানের উর্ধ্বে হইলেই যে শ্রমের সরবরাহ বাড়িয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো শ্রমের সরবরাহ বাড়িতে পারে—অর্থাৎ বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজে আসিতে পারে অথবা একই সংখ্যক শ্রমিক বেশিক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সময় বাড়িয়া যাইবে। মজুরী বাড়াইলে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার শ্রমের সরবরাহ কমিতেও পারে। মনে করা যাক, কোন এক কয়লার খনির কর্মীদের হয়তো মজুরী বাড়ানো হইল। দেখা গেল, শ্রমের সরবরাহ কমিতে লাগিল; কারণ পরের দিন হইতে কর্মীরা ইচ্ছা করিয়া কাজে অনুপস্থিত হইতেছে, পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের বেশি অবসর ভোগ করিবার ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। এক্ষেত্রে দেখা গেল মজুরী বাড়াইবার ফলে শ্রমের সরবরাহ কমিয়া গেল। আবার এমনও হইতে পারে যে কোন শ্রমিক বেশি রোজগার করিয়া দামী ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিতে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত বেশি মেলা-মেশা করিতে, আমোদ-আহ্লাদ করিতে চায়। কিন্তু ইহার জন্য বেশি মজুরীর সঙ্গে তাহার হাতে বেশি সময়ও থাকা চাই। কারণ তাহার মনে হইবে, বেশি টাকা পাইয়া উহা দিয়া যদি একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবার মতো সময়ই না পাই তাহা হইলে বেশি খাটিয়া লাভ কি? অপর পক্ষে অন্য শ্রমিকদেরও ঐ কয়লার খনিতে কাজ করিতে আসার অসুবিধা থাকিতে পারে। ফলে শ্রমের সরবরাহ কমিয়া যাইবে। এই জন্য মজুরী বেশি হইলেই যে শ্রমের সরবরাহ বাড়িবে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। বস্তুতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মজুরীর হার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কাজের সময় কমিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও কাজের সময় কমাইতে চাহে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে পারিশ্রমিকের হার (Monopoly Wage Rates) :

একচেটিয়া ব্যবসায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি মজুরী বাড়াইতে খুবই নিপুণ। প্রতিযোগিতা না থাকায় এই ধরণের ব্যবসায়ে লাভ খুব বেশি হয়। মজুরী বাড়াইতে গেলে হয় জিনিসের দাম আরও বাড়াইতে হয়, আর না হয় লাভ কমাইতে হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী জনমতের ভয়ে দাম বাড়াইতে পারিবে

না। সুতরাং মজুরী বাড়াইতে হইলে তাহাকে লাভের অঙ্কে হাত দিতে হইবে। তবে যদি জিনিসটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে এক-চেটিয়া ব্যবসায়ী একই সঙ্গে মজুরী এবং দাম দুই-ই বাড়াইতে পারিবে।

শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহ এবং পারিশ্রমিক (Demand for and Supply of Labour and Wages)

এখন দেখা যাক শ্রমের চাহিদা বা যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মজুরীর তারতম্য কেমন হয়। সাধারণতঃ চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়ে। তেমনি কোন শিল্পে যদি শ্রমের চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে মজুরীর হারও বাড়িবে। এখন নিম্নোক্ত দু'টি কারণে শ্রমের চাহিদা বাড়িতে পারে : (১) যদি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ) বাড়িয়া যায় কিংবা (২) যদি উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায়। কোন শিল্পে শ্রমের চাহিদা বাড়িলে বুঝিতে হইবে যে ঐ শিল্প খুব ভালই চলিতেছে। সেক্ষেত্রে শিল্প-পতিরা শ্রমিককে বেশি মজুরী দিবে। তেমনি আবার কোন শিল্পে যদি শ্রমের সরবরাহ কমে, অর্থাৎ উপযুক্ত সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শ্রমিক আকর্ষণ করিবার জন্য শিল্পপতিদের মজুরী বাড়াইতে হইবে। অপরপক্ষে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যদি কমিয়া যায় অথবা শ্রমের সরবরাহ যদি চাহিদা অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে মজুরীর হার কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পারিশ্রমিকের হারের পরিবর্তনও চাহিদা ও যোগানের নিয়মের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে।

প্রশ্নাবলী

১। আর্থিক মজুরী ও সামগ্রিক মজুরী কাহাকে বলে? সামগ্রিক মজুরী হিসাব করিতে কী কী বিষয় বিবেচনা করা দরকার?

(Distinguish between money or nominal wages and real wages. What are the main factors determining real wages ?) [পৃঃ ৭৮ দেখ]

২। বিভিন্ন কাজে মজুরীর হার বিভিন্ন হইবার কারণ কী?

(Explain why wages differ in different occupations.) [পৃঃ ৭৮-৭৯ দেখ]

৩। মজুরী কিভাবে নির্ধারিত হয়?

(How are wages determined ?) [পৃঃ ৭৯-৮০ দেখ]

৪। শ্রমিকসংঘ কী? শ্রমিকসংঘের কাজ কী?

(What is a Trade Union and what are its functions ?) [পৃঃ ৮০-৮১ দেখ]

৫। পারিশ্রমিক ও শ্রমের যোগানের পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয় কর। একচেটিয়া ব্যবসায়ে পারিশ্রমিকের হার কীভাবে নির্দিষ্ট হয়।

Describe the influence of rate wages on the supply of labour. How is rate of wages determind in a monopoly ? [পৃঃ ৮১-৮২-, ৮২-৮৩ দেখ]

সুদ
(Interest)

সুদ কাহাকে বলে (What is Interest ?)

একজনের নিকট হইতে অপর একজন টাকা ধার নিলে সে টাকার জন্য অধমর্ণ (যে ধার নেয়) উত্তমর্ণকে (যে ধার দেয়) আসল টাকা ছাড়া কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে, অর্থাৎ এই ধার পাইবার জন্য কিছু দাম দিতে, রাজী হয় ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দিয়াও থাকে। আসল ছাড়া যে টাকা দিতে হয় অর্থাৎ ধার পাইবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে দাম দিতে হয় সাধারণ কথায় তাহাকে সুদ বলা হয়।

নীট সুদ ও মোট সুদ (Net and Gross Interest)

যে ধারের টাকা ফেরত পাওয়া সম্বন্ধে উত্তমর্ণের কোন আশংকার কারণ থাকে না ও যে টাকা ফেরত পাইতে তাহাকে কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না সে টাকার সুদকেই অর্থবিদ্যায় সুদ বলা হয়। এ সুদকে নীট সুদ বা Net interestও বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ সব ধারের টাকা সম্পর্কেই উত্তমর্ণের কিছু না কিছু আশংকা ও উদ্বেগ থাকে এবং টাকার হিসাব রাখা ও টাকা আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু শ্রম তাহাকে করিতেই হয়। তাই, উত্তমর্ণ তাহার কষ্ট ও শ্রম স্বীকারের জন্য বেশি সুদ নেয় ও সাধারণতঃ সুদের হার নীট সুদ হইতে বেশি হইয়া থাকে। নীট সুদ ও উত্তমর্ণের পারিশ্রমিক মিলিয়া যে সুদের হার ঠিক হয় তাহাকে মোট সুদ বা Gross interest বলা হয়।

কোন ব্যক্তি তাহার বিশেষ প্রয়োজনে অপরের নিকট হইতে সুদ দিবার সর্তে টাকা ধার করে। ব্যবসায়ীরা নূতন মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে সুদ দিয়া টাকা ধার করে। কোন দেশের সরকারও কোন উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ও যুদ্ধাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার করে।

অপরপক্ষে সঞ্চয়ী লোকেরা ও ব্যাংকসমূহ টাকা ধার দেয়।

সুদের হার (Rate of Interest) :

দ্রব্যের মূল্যের মতই বিনিয়োগযোগ্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর সুদের হার নির্ভর করে। টাকার চাহিদা বাড়িলে (যোগানের তুলনায়) সুদের হার বাড়িবে এবং যোগান বাড়িলে (চাহিদার তুলনায়) সুদের হার

কমিবে। এইভাবে সুদের যে হারে চাহিদা ও যোগান সমান হইবে সেই হারে সুদ নির্দিষ্ট হইবে।

বিনিয়োগযোগ্য অর্থের যোগান নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর : (১) লোকেদের সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর, এবং (২) নিজেদের কাছে গচ্ছিত না রাখিয়া ঐ সঞ্চিত অর্থ ধার দিবার ইচ্ছার উপর। লোকেরা কী পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে তাহা নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহাদের আয়ের পরিমাণের উপর ; যাহাদের আয় বেশি তাহারা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে। তবে সঞ্চিত অর্থ ধার দিয়া এবং সুদে খাটাইয়া ভবিষ্যতে আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার আশাতেও লোকে যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। লোকের মোট আর্থিক আয় সমান থাকিয়া সুদের হার বাড়িলে, সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে আশা করা যায়। এই সঞ্চিত অর্থের সবটাই সঞ্চয়কারী অপরকে ধার দিতে চাহে না, কিছুটা সে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে। যদি ধার দিয়া সুদ কম পাওয়া যায় তাহা হইলে লোকেরা কম টাকা সুদে খাটায়, সঞ্চয়ের বেশির ভাগই নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে ; সুদের হার যতই বেশি হইবে ততই গচ্ছিত অর্থ অপরকে ধার দিয়া বিনিয়োগ করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ বাড়িবে। সুতরাং সুদের হার বৃদ্ধির সহিত বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিরূপিত হয়

বিনিয়োগযোগ্য অর্থের চাহিদা প্রধানতঃ তিন দিক্ হইতে হয়,—ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক, এবং সরকারের তরফ হইতে। সাধারণ লোকে সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অনেক সময় ধার করে, কিন্তু দেশের মোট ঋণের পরিমাণের তুলনায় এইরূপ ঋণ অতি সামান্য। সরকার ধার করে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য, যুদ্ধ প্রভৃতি আকস্মিক কারণের জন্য, অথবা রেলপথ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য। সরকার এইসব কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ কর চাপাইয়া বা নোট ছাপাইয়াও সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অন্য অসুবিধা আছে বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল কাজের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুদের হার কম হইলে সরকার ঋণ বেশি নেয় এবং সুদের হার বেশি হইলে সরকার ঋণ কম নেয় এবং অন্য উপায়ে প্রয়োজনীয় বাকী অর্থ সংগ্রহ করে। বিনিয়োগযোগ্য অর্থের চাহিদা প্রধানতঃ আসে ব্যবসায়ীদের দিক্ হইতে। তাহারা টাকা ধার

লইয়া স্থায়ী ও চল্‌তি মূলধন বাড়ায় এবং তাহার ফলে অধিকতর উৎপাদন করিয়া নিজেদের আয় বৃদ্ধি করে। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও মূলধনের চাহিদা স্থদের হারের উপর নির্ভর করে; স্থদের হার কম হইলে মূলধনের চাহিদা বাড়ে, স্থদের হার বাড়িলে মূলধনের চাহিদা কমে, এবং যে পরিমাণ মূলধন হইতে প্রান্তিক আয় স্থদের হারের সমান হয়, প্রত্যেক ব্যবসায়ী সেই পরিমাণ মূলধনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে।

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে সরকার এবং ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগযোগ্য অর্থের জন্য চাহিদা স্থদের হারের উপর নির্ভর করে। স্থদের হার যত বেশি চড়া হইবে, মূলধনের চাহিদা ততই কম হইবে; আর স্থদের হার যত কম হইবে মূলধনের চাহিদা ততই বেশি হইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় স্থদের হার এমন হয় যাহাতে মূলধনের চাহিদা ইহার জোগানের সমান হয়

কোন নির্দিষ্ট স্থদের হারে মূলধনের চাহিদা যদি যোগানের চেয়ে বেশি হয় তাহা হইলে স্থদের হার বাড়িয়া যাইবে; ফলে যতক্ষণ চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান্ না হয়, ততক্ষণ চাহিদা কমিতে থাকিবে এবং যোগান বাড়িতে থাকিবে। আর মূলধনের যোগান যদি চাহিদার চেয়ে বেশি হয়, তাহা হইলে স্থদের হার কমিয়া যাইবে; ফলে যতক্ষণ চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান না হয় ততক্ষণ চাহিদা বাড়িতে থাকিবে এবং যোগান কমিতে থাকিবে। ভারসাম্য অবস্থায় স্থদের হার এমন হয় যাহাতে মূলধনের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হয়।

সাধারণ লোকের, ব্যবসায়ীর, ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারের ধারের চাহিদা স্থদের হারের উপর নির্ভরশীল হইলেও, যুদ্ধের জন্য সরকারের ধারের চাহিদা স্থদের হারের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের জন্য সরকার যে কোন স্থদের হারে ধার করিতে প্রস্তুত থাকে বা বাধ্য হয়।

স্থদের হারের তারতম্য ঃ স্থদের হারের তারতম্যের প্রধান কারণ উত্তমর্ণকে টাকা ধার দিয়া যে ঝুঁকি নিতে হয় তাহার পরিমাণের তারতম্য।

(১) ঝুঁকি বেশি হইলে স্থদের হার বেশি হয় ও ঝুঁকি কম হইলে স্থদের হার কম হয়। এই কারণে সরকার যে স্থদে টাকা ধার পায় ব্যবসায়ীরা তাহা অপেক্ষা বেশি স্থদে ধার করে এবং দরিদ্র চাষী সবচেয়ে বেশি স্থদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়।

(২) একই কারণে জামানত বা বন্ধক দিয়া ধার করিলে জামানত ব

বন্ধক ছাড়া ধারের চেয়ে সুদের হার কম হয়। জামানতের শ্রেণীবিভাগ আছে। যে জামানত বিক্রয় করিয়া সর্বদা অনায়াসে টাকা ওয়াশীল করা যায় সে জামানত শ্রেষ্ঠ ও সে জামানতে অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়।

(৩) সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য সুদের হার বেশি এবং স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের হার কম ধরা হয়।

সুদের তারতম্যের অপর কারণ উত্তমর্ণের পরিশ্রমের তারতম্য। যেখানে টাকা ধার দিয়া আদায়ের জন্য উত্তমর্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় সেখানে সুদের হার বেশি হয়।

প্রশ্নাবলী

১। সুদ কাহাকে বলে? নীট সুদ ও মোট সুদের পার্থক্য দেখাও। [পৃঃ ৮৪ দেখ]
(What is interest ? Distinguish between net and gross interest.)

২। সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয়?
(How is the rate of interest determined ?) [পৃঃ ৮৪-৮৬ দেখ]

৩। সুদের হারের তারতম্যের কারণ কী?
(Explain why there are differences in the rates of interest.)
[পৃঃ ৮৬-৮৭ দেখ]

৪। "উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মূলধনের মূল্য বা সুদের হার নির্ণীত হয়"—ব্যাখ্যা কর।
(" The interaction of the forces which influence borrowers and lenders, results in a price for the service of capital—the rate of interest."—Elucidate.) [পৃঃ ৮৪-৮৬ দেখ]

লাভ
(Profit)

লাভের প্রকৃতি (Nature of Profit) : পূর্বে জানিয়াছ উৎপাদনের উপাদান (factors of production) চারটি—জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা বা উদ্যোগ। উদ্যোক্তা অপর তিনটি উপাদানের সমন্বয় সাধন করে ও লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নেয়। উদ্যোক্তা (Entrepreneur) জমির জন্য খাজনা, শ্রমের মজুরী ও মূলধনের জন্য সুদ দেয়। **খাজনা, মজুরী ও সুদ দিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই তাহার লাভ।**

খাজনা, মজুরী ও সুদ দিতেই হয় এবং এ-সবের পরিমাণ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে। এ সমস্ত দিয়া উদ্বৃত্ত থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। তাই, লাভ অনিশ্চিত ও তাহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

কোন উদ্যোক্তা যদি নিজের জায়গায় নিজের টাকায় কারবার করে তবে তাহাকে অপর কাহাকেও খাজনা বা সুদ দিতে হয় না। কিন্তু তাহারও লাভ হিসাব করিতে জমি ও মূলধন বাবদ প্রাপ্য খাজনা ও সুদ বাদ দিতে হইবে।

উদ্যোক্তা যে লাভ পায় তাহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিক ও ঝুঁকি নেওয়ার জন্য পুরস্কার থাকে।

একচেটিয়া কারবারে উদ্যোক্তার লাভ বেশি হয়।

আবার কখনও কখনও আকস্মিক কোন কারণে (যেমন যুদ্ধ) ব্যবসায়ী হঠাৎ অনেক লাভ পাইতে পারে।

লাভের উপাদান (**Elements in Profit**) **:** পরিচালনার শ্রমের পারিশ্রমিক, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি লওয়ার পুরস্কার, একচেটিয়া কারবারের লাভ, অকস্মাৎ মূল্য বাড়িয়া যাওয়ার লাভ—এ সকলই লাভের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বোক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে পরিচালনার শ্রমের পারিশ্রমিক ও লাভ-লোকসানের ঝুঁকি লওয়ার পুরস্কার **স্বাভাবিক লাভ বা Normal Profit** ও অন্যান্য উপাদান আকস্মিক। যথেষ্ট সময় কারবার চালাইয়া গেলে সব উদ্যোক্তাই স্বাভাবিক লাভ পাইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

লাভ কাহাকে বলে? লাভের উপাদান কী কী? স্বাভাবিক লাভ কী?

(Define profit. What are the elements in profit ? What is normal profit ?)

[পৃঃ ৮৮ দেখ]

সরকারের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকর্ম

(Economic Functions of the Government)

দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে সরকারী প্রচেষ্টা (Governments funetions in the economic development of a country) :

গত শতাব্দীতে প্রচলিত অর্থ নৈতিক ধারণা ছিল যে সরকার অর্থ নৈতিক সমস্ত প্রচেষ্টায় নিরপেক্ষ থাকিবে ও কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিবে না। সরকারী হস্তক্ষেপে মংগল অপেক্ষা অমংগলের আশংকা বেশি। ব্যক্তি স্বীয় আর্থিক উন্নতির উপায় নিজে উদ্ভাবন করিবে ও নিজের প্রচেষ্টায় অভীষ্ট উন্নতি সাধন করিবে এবং ব্যক্তিসমূহের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশের আর্থিক উন্নতিও সাধিত হইবে।

কিন্তু কালক্রমে এ ধারণা আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক কল্যাণধর্মী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বব্যাপী। অসমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রেও রাষ্ট্র জনসাধারণের অর্থ নৈতিক. জীবনে হস্তক্ষেপ করে। কারণ, জনসাধারণের সর্বাংগীণ মংগলের জন্য দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার যে নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক তাহা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অসম্ভব এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রই সে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে ও তাহা প্রয়োগ করিতে পারে।

সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে পারে। আইন প্রণয়নদ্বারা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিয়া সরকার পরোক্ষভাবে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিতে পারে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে পারে বা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে। শ্রমিক-আইন প্রণয়নদ্বারা শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, দেশী ও বিদেশী অর্থের বিনিময়হার-নির্ধারণ ও বেকার-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি আজ রাষ্ট্রের নিজস্ব দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত। রাষ্ট্র শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও ঐ দ্রব্যের মান স্থির করিয়া দিতে পারে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সরকার অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন নিরোধ করিতে পারে। বর্তমানে কোন অংশীদারী কারবার, যৌথমূলধনী কারবার বা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে সরকারের অনুমোদন অত্যাবশ্যক। আধুনিক

সরকার এমনভাবে কর ধার্য করে যাহাতে ধনী-দরিদ্রের আয়-বৈষম্য ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সরকার আজকাল নানা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ও ঐ সকল পরিকল্পনার রূপায়ণে অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিয়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিরপথ সুগম করে ও স্থায়ী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে।

সরকারী আয়ব্যয় (Government Finances) ঃ

রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা, এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। তাহা ভিন্ন পূর্বে বলা হইয়াছে যে আধুনিক সরকার নানা জনকল্যাণমূলক কার্যের ব্যবস্থা করে ও বহু অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। সরকারের এই সকল বিভিন্ন কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। কোন মানুষ যেমন আয় না থাকিলে ব্যয় করিতে পারে না, সরকারও তেমনই আয় না থাকিলে ব্যয় করিতে পারে না। ব্যক্তি যেমন নিজের হাতে টাকা না থাকিলে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে ধার করে, সরকারও তেমনই অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে ধার করে।

তবে ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয় একই নিয়মে চলে না।

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য (Distinction between Private and Public Finance) ঃ

ব্যক্তি ও সরকার উভয়কেই আয়ের উপায় ও কিরূপে তাহার সদ্ব্যয় করা যায় তাহা ভাবিতে হয়। তবে ব্যক্তি তাহার আয় অনুসারে ব্যয় করে, প্রয়োজন হইলে ব্যয় কমায়, কিন্তু সরকার ব্যয়ের অনুপাতে আয় নির্দিষ্ট করে। সরকার একটা পরিকল্পনা করিয়া যদি দেখে যে সাধারণ যে আয় আছে তাহাতে খরচ কুলাইবে না তখন নূতন কর ধার্য করিয়া সে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি প্রয়োজনানুযায়ী আয় বাড়াইতে পারে না।

সরকার পরিকল্পিত ব্যয়ের জন্য দেশের মধ্য হইতে বা বিদেশ হইতে ধার করিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

সরকার প্রয়োজনে কাগজী অর্থ (নোট) ছাপাইয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

নীতিগতভাবে, ব্যক্তির আয় অনুসারে ব্যয় করা কর্তব্য। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র এ নীতি পালন করিতে গেলে সংগঠন বা জনকল্যাণমূলক বহু কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

সরকারের আয়ের উপায় (Sources of Revenue) ঃ

সম্পত্তির আয় ঃ ব্যক্তির মত রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি থাকিতে পারে (যেমন বন)। তাহা হইতে সরকারের আয় হয়।

ব্যবসায়ের আয় ঃ ব্যক্তির মতই সরকারও ব্যবসায় পরিচালনা করিতে (যেমন রেলওয়ে) পারে। তাহাতে সরকারের আয় হয়।

ফী (Fees) ঃ সরকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য অনেক কাজ করে ও সে সকল কাজের জন্য ফী আদায় করে (বিচারের জন্য কোর্ট ফী, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ফী ইত্যাদি)। ইহা হইতে সরকারের আয়।

কর (Taxes) ঃ সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় হয় কর হইতে (যেমন আয় কর, আমদানী-রপ্তানী কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি)।

কর (Taxes) :

সরকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য কোন কাজ করিয়া তাহার জন্য যে মূল্য আদায় করে তাহা ফী। একজন ব্যক্তি পাঁচ নয়া পয়সা দিয়া একখানা পোস্ট কার্ড কিনিলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে খবর পাঠাইবার সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে পাঁচ নয়া পয়সা ফী। কিন্তু করের বিনিময়ে করদাতা সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধা পায় না। রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ধার্য হয়।

যে সুবিধার জন্য ফী দিতে হয় সে সুবিধা না চাহিলে কোন ফী দিতে হয় না। যেমন, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় খবর দিবার সুবিধা না চাহিলে পোস্টকার্ড বাবদ পাঁচ নয়া পয়সা ফী দিতে হয় না। কিন্তু কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর আয় হইলে আয়কর (Income tax) দিতেই হইবে। আয়কর না দিলে বা এড়াইবার চেষ্টা করিলে অপরাধ হইবে।

কোন বিশেষ সুবিধার দাবী বা প্রত্যাশা ব্যতীত, আইন অনুসারে বাধ্য হইয়া সরকারকে যে অর্থ দিতে হয় সেই দেয় অর্থকে কর বলা হয়। ("Taxes are general compulsory contributions of wealth levied upon persons, natural or corporate, to defray the expenses incurred in conferring a common benefit upon the residents of the state.")

কর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes) :

যাহার উপর কর ধার্য করা হয় সে নিজেই করভার বহন করিলে সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। যাহার উপর সরকার আয়কর ধার্য করে তাহাকেই আয়কর দিতে হয়। সে করভার অন্যের উপর চাপাইতে পারে না। তাই আয়কর প্রত্যক্ষ কর।

বিক্রয় কর (Sales Tax) বা প্রমোদ কর (Amusement Tax) পরোক্ষ কর। সরকার দোকানদারের উপর বিক্রয় কর ধার্য করে ও তাহার নিকট হইতে সে কর আদায় করে। কিন্তু করভার দোকানদার বহন করে না। যে যে দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর ধার্য আছে সেই সেই দ্রব্য বিক্রয়কালে দোকানদার ক্রেতার নিকট হইতে দাম বেশি লইয়া (পশ্চিমবংগে টাকাপ্রতি পাঁচ নয়া পয়সা) ক্রেতার নিকট হইতে সেই কর আদায় করে। সুতরাং, বিক্রয় করের আপাতভার দোকানদারের উপর হইলেও শেষ ভার ক্রেতার উপর। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আপাতভার ও শেষভার একই ব্যক্তি বহন করে।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধা : প্রত্যক্ষ করের সুবিধা এই : (ক) করদাতা নিশ্চিতভাবে জানে তাহাকে কী পরিমাণ কর দিতে হইবে ; (খ) সরকার জানে কাহার উপর কর ধার্য করা হইতেছে এবং করদাতার সামর্থ্য অনুসারে (দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর উপর বেশি) কর ধার্য করা যায় এবং প্রয়োজনমত করের হার বৃদ্ধি করা যায় ; (গ) প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের জন্য সরকারের ব্যয় অল্প হয় ; (ঘ) করদাতা প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে বলিয়া সরকার কীভাবে টাকা ব্যয় করে সে-বিষয়ে সে সচেতন হয় ও এইভাবে করদাতাগণের নাগরিক চেতনা বাড়ে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা এই যে (ক) করদাতা প্রত্যক্ষভাবে করভার অনুভব করে বলিয়া ইহা পছন্দ করে না ; (খ) করদাতা পছন্দ করে না বলিয়া কর ফাঁকি দিতে সে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করে ; (গ) কোন ন্যায়-সংগত প্রণালীর অভাবে এ কর অনেক সময় সরকারের খুশীমত ধার্য হয়।

পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধা : পরোক্ষ করের সুবিধা এই যে (ক) করদাতা জানে না যে তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে। সুতরাং, পরোক্ষ কর জনসাধারণের অপ্রিয় হয় না। (খ) পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া ধনী-দরিদ্র সকলের নিকট হইতে কর আদায় করা যায়। (গ) পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া দ্রব্যের ব্যবহার কমান যায়

এ ভাবে মাদক দ্রব্য, বিদেশী সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতির ব্যবহার কমাইয়া সমাজের মংগল করা যায়।

পরোক্ষ করের অসুবিধা এই যে, (ক) ইহা করদাতার সামর্থ্যানুযায়ী ধার্য করা যায় না ও দরিদ্রের পক্ষে পীড়াদায়ক হইতে পারে। (খ) করদাতা দেয় করের পরিমাণ জানে না। (গ) ইহা করদাতার নাগরিক চেতনা জাগায় না বা বাড়ায় না। (ঘ) এ কর আদায় করা ব্যয়সাধ্য।

কর ধার্যের নীতি (Canons of Taxation) ঃ Adam Smith কর ধার্য করার চারিটি নীতি নির্দেশ করিয়াছেন ঃ সাম্য, নিশ্চয়তা, সুবিধা ও মিতব্যয়িতার নীতি।

সাম্য নীতি (Canon of Equality) অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতা অনুসারে (অর্থাৎ তাহার আয় অনুসারে) কর দিতে হইবে।

নিশ্চয়তার নীতি (Canon of Certainty) অনুসারে সরকার প্রত্যেক করদাতাকে জানাইয়া দিবে যে কখন কী ভাবে ও কী পরিমাণ কর তাহাকে দিতে হইবে।

সুবিধার নীতি (Canon of Convenience) অনুসারে এমন সময়ে ও এমনভাবে কর আদায় করিতে হইবে যেন করদাতাকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়। এ নীতির অর্থ এই যে কর আদায়ের সময় ও পদ্ধতি করদাতার সুবিধানুযায়ী হইবে।

মিতব্যয়িতার নীতির (Canon of Economy) অর্থ এই যে কর আদায় ব্যয়সাধ্য হইবে না। ধার্য করের অধিকাংশ রাজকোষে জমা না হইলে কর ধার্য করার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

আধুনিক কালে উক্ত চারিটি নীতি ছাড়াও দুইটি নীতি গৃহীত হইয়াছে—**স্থিতিস্থাপকতার নীতি** (Canon of Elasticity) ও **উৎপাদনক্ষমতার নীতি** (Canon of Productivity)। স্থিতিস্থাপকতার নীতি অনুসারে এমন কয়েকটি কর থাকা উচিত যেগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ান বা কমান হয়। উৎপাদন ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী ধার্য করের পরিমাণ রাষ্ট্রের কার্য নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু দেশের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা কোন প্রকারে ব্যাহত করা চলিবে না।

সমানুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান হারে কর (Proportional and Progressive Taxation) ঃ আয় বা সম্পত্তির পরিমাণগত কোন পার্থক্য না করিয়া

সকল প্রকার আয় বা সম্পত্তির মূল্যের উপর সমান হারে কর ধার্য হইলে সে করকে সমানুপাতিক হারে কর বলা হয়।

আয়ের বৃদ্ধির সংগে সংগে করের হারও যদি বাড়ে তবে সে করকে ক্রমবর্ধমান বা প্রগতিশীল কর বলা হয়।

যদি ঠিক করা হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আয়ের শতকরা ২৲ কর দিবে—১০০৲ আয় হইলে ২৲ এবং ১০০০৲ আয় হইলে ২০৲ দিতে হইবে—তখন সে কর সমানুপাতিক কর। অপর পক্ষে যদি ঠিক করা হয় যে ১০০৲ আয় হইলে শতকরা ২৲, ৫০০৲ আয় হইলে শতকরা ৪৲ ও ১০০০৲ আয় হইলে শতকরা ৮৲ কর দিতে হইবে (আয় বাড়ার সংগে সংগে করের হারও যদি বাড়ে) তখন সে কর ক্রমবর্ধমান বা প্রগতিশীল কর।

আধুনিক সকল সরকারই ক্রমবর্ধমান কর প্রথা প্রবর্তন করিতেছে। ভারতবর্ষের আয়কর ক্রমবর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। এ প্রথার মূলগত নীতি এই যে ধনীদের কর দিবার ক্ষমতা অধিক, সুতরাং তাহাদের অধিক কর দেওয়া উচিত।

সকল প্রকার কর ক্রমবর্ধমান হারে ধার্য করা যায় না। সকল প্রকার পরোক্ষ করই প্রগতিশীল করের নীতি-বিরুদ্ধ। কারণ এ শ্রেণীর করভার ধনীদের অপেক্ষা দরিদ্ররাই বেশী বহন করে।

সরকারী বা জাতীয় ঋণ (Public debt) : পূর্বে বলা হইয়াছে যে সরকার সাধারণ ব্যক্তির মত নিজস্ব প্রয়োজনে ধার করিতে পারে। সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে জাতীয় ঋণ বলে। সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে বা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। জাতীয় ঋণ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দুই প্রকারই হইতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ঋণ শোধের মেয়াদ সাধারণতঃ এক বছরের বেশি হয় না।

সরকার যুদ্ধাদির দরুণ প্রয়োজনীয় অস্বাভাবিক খরচের জন্য বা উন্নয়নমূলক কোন প্রচেষ্টার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। যুদ্ধাদির জন্য ঋণকে অনুৎপাদনশীল (Unproductive) ও উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ঋণকে (রেলপথ বসাইবার জন্য ঋণ—টাকা খাটাইয়া সরকার আয় করে এবং তাহা হইতে সুদ ও আসল শোধ করে) উৎপাদনশীল ঋণ (Productive debt) বলে।

জাতীয় ঋণের সুদ সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ শোধের সাধারণ উপায় হইল, ঋণ শোধের জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করিয়া

প্রতিবৎসর রাজস্বের এক অংশ সেই তহবিলে জমা রাখা ও পরে সেই টাকা দিয়া ঋণ শোধ করা।

সরকারের ব্যয় (Public Expenditure) : সরকারের ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যরক্ষা, জনশিক্ষা বিস্তার, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি।

সরকারের অর্থব্যয়ের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন, ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের অধিক উন্নতি সাধন, ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের সহায়ক মূল-শিল্পসমূহের প্রসার ও উন্নতি সাধন এবং কার্যক্ষম সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান।

প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। [পৃঃ ৮৯-৯০ দেখ]
(Describe the economic functions of a modern Government.)

২। ব্যক্তিগত আয়ব্যয় ও সরকারী আয়ব্যয়ের পার্থক্য কী? [পৃঃ ৯০ দেখ]
(Distinguish between private and public finance.)

৩। সরকারের আয়ের উপায় কী কী? [পৃঃ ৯১ দেখ]
(Describe the sources of revenue of a Government.)

৪। কর কাহাকে বলে? কর ধার্য করার নীতি কী কী?
(Define tax. What are the canons of taxation ?) [পৃঃ ৯১-৯৩ দেখ]

৫। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণ বর্ণনা কর।
(Distinguish between a direct and an indirect tax. Discuss the merits and demerits of a direct and an indirect tax.) [পৃঃ ৯২-৯৩ দেখ]

৬। (ক) সমানুপাতিক হারে কর, (খ) প্রগতিশীল কর, (গ) জাতীয় ঋণ—সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(Write short notes on—(a) Proportional tax (b) Progressive tax and (c) National Debt.) [পৃঃ ৯৩, ৯৪, ৯৫ দেখ]

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পূর্বে বলা হইয়াছে যে কোন দেশের সর্বাংগীণ ও সর্বজনীন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আজকাল অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রথমতঃ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত ও রূপায়িত হইলেও এখন অসমাজতান্ত্রিক দেশেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ও জাতীয় আয় বাড়ান।

পরিকল্পনা করা অর্থ কোন কাজ করার আগে সেই কাজের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ভাবিয়া ঠিক করা। কোন এক বা কতিপয় নির্দিষ্ট অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হয় তাহাকে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বলা হয়।

পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। পরিকল্পনা রচনার জন্য সরকার বিশেষজ্ঞদের লইয়া এক পরিকল্পনা পরিষদ (Planning Commission) গঠন করে। এই পরিষদ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া পরিকল্পনা রচনা করে এবং পরিকল্পনা কী ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যাইতে পারে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। প্রত্যেক পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা থাকে।

পরিকল্পনার উপাদান (Elements in Planning) :

যে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার **প্রথম উপাদান, মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ।** অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইতে পারে (উৎপাদন বৃদ্ধি, সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান প্রভৃতি)। উদ্দেশ্যের উপরই উদ্দেশ্য সাধনের পদ্ধতি নির্ভর করিবে। **দ্বিতীয় উপাদান, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বনীয় সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ।** একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। অবলম্বনীয় পদ্ধতি সহজ হইতে হইবে। পদ্ধতি নির্ধারণ বিষয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, গণচরিত্র ইত্যাদি বিচার করা আবশ্যক। উদ্দেশ্য ও উপায় স্থির করার পর পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হইলেই দেখা যাইবে যে মূলধন অত্যাবশ্যক। তাই, **তৃতীয় উপাদান**

—মূলধন সংগ্রহ ও অগ্রাধিকার অনুসারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ।

মূলধন কত আছে এবং আরো কত দরকার তাহা প্রথমে হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থার পর কোন্ দিকে, কী ভাবে, কী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিলে মূল উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য অর্থসংগ্রহের একটি পদ্ধতি হইল অতিরিক্ত কর ধার্য করা। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে সরকার বেশী কর ধার্য করে ও উদ্বৃত্ত রাজস্ব মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করে। কিন্তু অনগ্রসর দরিদ্র দেশে এ উপায়ে যথেষ্ট মূলধন সংগৃহীত হয় না। অর্থসংগ্রহের দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসাবে সরকার দেশে ও বিদেশে টাকা কর্জ করে। কর্জ করিয়াও প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত না হইলে তৃতীয় উপায় হইল কাগজী নোট ছাপান। তবে কাগজী নোট ছাপান সম্পর্কে যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে অবাঞ্ছনীয় মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে।

পরিকল্পনার **চতুর্থ উপাদান—বিভিন্ন দিকে একই সংগে প্রয়োজনমত অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করা।** আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র; তাই তাহারা যথেষ্ট খাদ্য ও বস্ত্র খরিদ করিতে পারে না। তাহাদের আয় বাড়িলেই তাহারা অধিক খাদ্য ও বস্ত্র খরিদ করিবে। সুতরাং, পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের আয় বাড়াইবার সংগে সংগে খাদ্য ও বস্ত্রের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে খাদ্য ও বস্ত্রের উৎপাদন বা যোগান বাড়াইতে হইবে। অন্যথায় খাদ্য ও বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

পঞ্চম উপাদান—প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য একটা উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মিবৃন্দের উপর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল।

॥ ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ ॥

দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

পরিকল্পনাগুলিতে প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। উন্নয়নের প্রত্যেক ধাপের জন্য পাঁচ বৎসর করিয়া সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমাপ্য প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনাকে এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হয়।

ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক। জনগণের সহযোগিতায় কর্মসূচীকে রূপায়িত করিয়া, ১৯৭৭ সালের মধ্যে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করাই পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য। যতদূর সম্ভব সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করিয়া এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ভারতের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য। তাই উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার আগে দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং একটা দৃঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তোলা দরকার। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত।

দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। আবার শিল্পোৎপাদন বাড়াইতে যে মূলধন ও কাঁচামাল দরকার, তাহা সংগ্রহ করিতে কৃষির উন্নতিই সর্বপ্রথম আবশ্যক। এ কথা বিবেচনা করিয়াই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতিকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের কৃষিব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে জল ও সেচব্যবস্থার অভাব, চাষীর অর্থাভাব ও ঋণ, চাষের জমির ক্ষুদ্রায়তন ও ভূমিব্যবস্থার ত্রুটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি, মূলধনের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব ও শক্তি উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থার অভাব। উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই সমস্ত ত্রুটি দূর করিয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যথোচিত ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল—

(ক) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ;
(খ) জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন ;
(গ) চলাচল ব্যবস্থা ;
(ঘ) শিল্প ;
(ঙ) সমাজ কল্যাণ ;
(চ) পুনর্বাসন ;
এবং (ছ) কর্মসংস্থান।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) দ্বারা গ্রামবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়।

প্রথম পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই পূর্ণ হইয়াছে। মোট ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধরিয়া নিলেও জনপ্রতি আয় শতকরা ১১ ভাগ (২৫৪৲ টাকা হইতে ২৮১৲টাকা) বাড়িয়াছে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয়ের বৈষম্য হ্রাস করার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার ইংগিত প্রথম পরিকল্পনায় পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, প্রথম পরিকল্পনা সমগ্র দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য জনগণের মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের ভিত্তিতে প্রথমটি অপেক্ষা বৃহত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত। জনসাধারণের কেবল অর্থ নৈতিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হয় নাই। জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন ও বুদ্ধিবিকাশের পথে সুযোগ সৃষ্টি করাও এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। অগ্রগতির পথ স্থির করিতে ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। লক্ষ্য রাখা হইয়াছে সমগ্র সমাজের কল্যাণের দিকে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে যেমন জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে তেমনি আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস পাইবে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' (Socialistic pattern of Society) দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

সাধারণভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য—

(ক) জাতীয় আয় বাড়াইয়া দেশের জীবনযাত্রার মান বাড়ান ;

(খ) মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করা ঃ
(গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়ান ঃ
এবং (ঘ) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক শক্তির সুষম বণ্টন করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা ও কর্মসূচী দুই অংশে বিভক্ত করা হয় ঃ প্রথম অংশের জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। যে সকল কর্মসূচী মূলতঃ কৃষি-উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করিবে এবং যে সকল পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া বাদ দেওয়া যায় না, সেগুলি প্রথম অংশের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অংশের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে এবং যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে সেই অনুসারে কাজে হাত দেওয়া হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপরই মূলতঃ বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। তবুও পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য খাদ্যোৎপাদন বাড়ানও প্রয়োজন। বেশী সার ও ভাল বীজের ব্যবহার, ভূমিসংরক্ষণ ও চাষের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন এবং জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয় সম্প্রসারণসূচী (National Extension Programme), সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হইয়াছে। এ পরিকল্পনায় ফল-চাষ, মৎস্য-চাষ, পশুপালন ও বনসংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য বিশেষ কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্য উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে।

১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ১ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বাড়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী ও সমষ্টি উন্নয়ন সূচী মারফত গ্রামাঞ্চলে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমগ্র দেশে সমষ্টি-উন্নয়ন কার্যসূচী চালু হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়নকার্যসূচী রচনা ও রূপায়ণের ভার দান করার প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন মোট শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ে।

সরকারী ও বেসরকারী দুই তরফেই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। বেসরকারী তরফেও উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বেসরকারী বিভাগে যথেষ্ট উৎপাদন বাড়িবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োজিত অর্থের অধিকাংশ লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মত মূল শিল্পগুলির উন্নয়নে ব্যয় করা হইতেছে। রউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইতেছে। লৌহ আকরিক, জিপসাম, ম্যাংগানিজ, বকসাইট ও খনিজ তৈল উত্তোলনের কাজে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সরকারী শিল্পগুলিতে রেলের ইঞ্জিন, রেলের কামরা, ডি. ডি. টি, পেনিসিলিন, সংবাদপত্রের কাগজ, বিদ্যুৎবাহী তার ও মেসিন টুলস্ (machine tools)-এর উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে।

কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই সব শিল্প গ্রামবাসীদের সাময়িক কর্মহীনতা, বেকার অবস্থা ও আয়ের বৈষম্য দূর করিয়া সম্পদের সুষম বণ্টনে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ, জাহাজ-চলাচল ও সড়ক-উন্নয়নে খুব বেশী অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্য পূরণ করিতে রেলওয়ের মাল-বহনের ক্ষমতা ও সরঞ্জাম বাড়াইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। জাহাজের সংখ্যাও বাড়ান হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসহ ১ লক্ষ ২২ হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ১ লক্ষ ৯৫ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা তৈয়ারী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ

হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও চিকিৎসালাভের সুযোগ এবং শিল্প-শ্রমিকদের, উদ্বাস্তুদের, তপশীলী ও উপজাতিসহ অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সমাজকল্যাণমূলক কার্যসূচী রচিত হইয়াছে।

শিক্ষা বিষয়ে—মৌলিক শিক্ষা (Fundamental Education) ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্নমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচীসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে—চিকিৎসাসমূহের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, গবেষণা, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, জল-সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ, পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সমাজকল্যাণ বিষয়ে—নারী ও শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ এবং বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সাড়ে চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হইলে সাড়ে ষাট লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইবে।

জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে অল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় আন্দোলনের গতি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ যাবৎ লব্ধ অভিজ্ঞতায় মনে হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : খসড়া রূপরেখা চূড়ান্ত রূপ না নিলেও, ইহার মধ্যেই তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার কাজও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

গত দশ বৎসর ধরিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ভারত জাতীয় উন্নয়নকার্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক শক্তি নিয়োগের প্রয়াস করিয়াছে। পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদনবৃদ্ধি ও জীবনধারণের মানোন্নয়ন মাত্র নয় : এমন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিন্যাস সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বোধ জাতীয় জীবনের সকল সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। জীবনধারণের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও মানবিক গুণাবলীর ভূমিকার উপর জোর দেওয়াও সেগুলির উদ্দেশ্য।

পূর্ব দুইটি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সম্মুখে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে :

(ক) জাতীয় আয় প্রতি বৎসর পাঁচভাগের বেশী বৃদ্ধি করা (যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ পনর বৎসরে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি শতকরা আশী ভাগের মত হয়)। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লগ্নীর পরিমাণও বাড়াইতে হইবে (দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা এগার ভাগ লগ্নীকৃত হইলে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় চৌদ্দভাগ লগ্নী করিতে হইবে)।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

(খ) খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা সম্পাদন এবং শিল্প ও রপ্তানীর চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(গ) শিল্প-রূপায়ণের জন্য ইস্পাত, ইন্ধন ও শক্তি (steel, fuel and power) প্রভৃতি মূল শিল্পের সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ও কর্মে নিয়োগের সুযোগের যথাসাধ্য সম্প্রসারণ করা।

(ঙ) আয় ও সম্পদের মধ্যে অসাম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টন করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন (খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা সম্পাদন ও শিল্প ও রপ্তানীর চাহিদা মিটান) এবং গ্রামবাসিগণের আয় ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের এবং অন্যান্য অংশের আয়ের সহিত তাহাদের আয়ের সমতা রক্ষার জন্য এই পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে যথেষ্ট সম্পদ নির্ধারিত করার প্রয়াস হইয়াছে।

সকল সময়েই কৃষি ও শিল্পকে একই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গণ্য করিতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় তরফকেই একসংগে গ্রহণ করিয়া সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলির ও অগ্রাধিকার-সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে। দেশের মানবিক সম্পদের উন্নয়ন এবং জন-উপলব্ধি ও জনগণের অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসেবার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষার সুযোগের প্রসার (তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইবে), ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার, গ্রাম ও শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের উন্নয়ন ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অংগীভূত হইয়াছে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির বাহিরে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি বাড়িতে পারে। উহার মধ্যে প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষের কর্মসংস্থান হইতে পারে :—প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক কৃষিতে নিযুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে মোট ১০,২০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকারী তরফে ব্যয়ের পরিমাণ ৬,২০০ কোটি ও বে-সরকারী তরফে ব্যয়ের পরিমাণ ৪,০০০ কোটি টাকা।

নীচে তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বরাদ্দ ও লগ্নীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

শ্রেণী	**সরকারী তরফ** পরিকল্পনার বরাদ্দ	বর্তমান বরাদ্দ	লগ্নী	**বেসরকারী তরফে লগ্নী**	**মোট লগ্নী**
	(কোটি টাকা)				
(ক) কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ, সমষ্টি উন্নয়ন	১০২৫	৩৫০	৬৭৫	৮০০	১,৪৭৫
(খ) বৃহৎ ও মাঝারি সেচ	৬৫০	১০	৬৪০	—	৬৪০
(গ) শক্তি	৯২৫	—	৯২৫	৫০	৯৭৫
(ঘ) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৫০	৯০	১৬০	২৭৫	৪৩৫
(ঙ) শিল্প ও খনিজ	১৫০০	—	১৫০০	১০০০	২৫০০
(চ) পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪৫০	—	১৪৫০	২০০	১৬৫০
(ছ) সমাজসেবা	১২৫০	৬০০	৬৫০	১০৭৫	১৭২৫
(জ) দ্রব্যতালিকা-সমূহ	২০০	—	২০০	৬০০	৮০০
মোট :	৭,২৫০	১,০৫০	৬,২০০	৪,০০০	১০,২০০

লগ্নীর চাহিদা মিটাইতে সঞ্চয় ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে, মূল ও মূলধনী পণ্যশিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আদান-প্রদানের ব্যবধান দূর করিতে হইবে। পরিকল্পনায় করবৃদ্ধির কথাও আছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরও তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বৈদেশিক ঋণ অপরিহার্য।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সমস্ত গ্রাম্য পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আবশ্যক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগও অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নাবলী

(১) সরকার কি কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে ?

(In what dffierent ways does the Government collect money ?)

(২) ফি ও করের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(What is the difference between fees and taxes ?)

(৩) কর ধার্য করিবার নীতিগুলি কি ? সর্বপ্রধান কোন্ ' নীতিটির ভিত্তিতে কর বসানো হয় ?

(What are the canons of taxation ? What is the main principle of taxation ?)

(৪) উদাহরণ দ্বারা করের সমহার, ক্রমবর্ধমান হার ও ক্রমহ্রাসমান হারের পার্থক বুঝাইয়া দাও।

(Explain and illustrate the distinction between the proportional progressive and regressive rates of texation.)

(৫) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(What is the differnce between direct and indirect taxes ?)

(৬) সরকার ঋণ গ্রহণ করে কেন ? সাধারণ লোকের ধারকজ এবং সরকারী ধারকজে'র মধ্যে পার্থক্য কি ?

(Why does the Government borrow money ? Distinguish between private debts and public debts.)

(৭) উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকার সাধারণতঃ কি ভাবে অর্থ জোগাড় করে ? ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে ?

(How does a Government generally finance development projects ? What arrangements in this respect does the Government of India make ?)

(৮) অনগ্রসর দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

(What are the characteristics of planning for the development of undeveloped countries ?)

৯। ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি ?

(What are the chief features of planning in India ?)

(১০) ভারতীয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সারমর্ম বুঝাইয়া দাও। ইহা কিরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে ?

(Give the substance of the first Five-Year Plan in India. How far has it attained success ?)

(১১) ভারতীয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সহিত ইহার পার্থক্য কি ?

(Sketch the outline of the second Five-Year Plan in India. How does it differ from the first Five-Year Plan ?)

(১২) ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোটামুটি রূপ বর্ণনা কর।

(Give a brief outline of the third Five year Plan of India.)

অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি

দ্বিতীয় ভাগ ঃ পৌরবিদ্যা

॥ ভূমিকা ॥

পৌরবিদ্যা কি ? (What is 'Civics') : Civics বা পৌরবিদ্যার প্রচলিত ধারণা ইংরেজী হইতে আমদানি করা। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতিতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইংরেজরা আবার এই ধারণা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গ্রন্থাদি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুপ্রাচীন কালে শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে সভ্যতায় য়ুরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ—সমগ্র য়ুরোপের শিরোমণি ছিল গ্রীস, এবং গ্রীসের পরে রোম। নানা প্রাকৃতিক বাধায় গ্রীস ছিল বহুধা বিভক্ত। তাই সমগ্র গ্রীস জুড়িয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সেই সুপ্রাচীন যুগে সম্ভব হয় নাই। এক একটি 'পুর' বা নগর এবং উহার নিকটবর্তী সামান্য কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত (যেমন এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি)। ঐ সকল পুর বা নগর-রাষ্ট্রের (Civitas*, City-State) যে সকল পুরুষ অধিবাসী রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত তাহাদিগকে নাগরিক (Civis*, Citizen) বলা হইত (স্ত্রীলোক, কায়িক শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের নাগরিকরূপে গণ্য করা হইত না)। পুরবাসী নাগরিকেরা নানা অধিকার ভোগ করিত এবং তাহাদের নানা কর্তব্য-পালনের দায়িত্বও ছিল। নগর-রাষ্ট্রের সংগে নাগরিকগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পর্ক এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হইত তাহাকে বলা হইত **পৌরবিদ্যা** (Civics)।

নগর-রাষ্ট্র

পৌরবিদ্যার প্রাচীন সংজ্ঞা

গ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এরূপ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু যে নাই তাহা নহে, অসম্ভবও। এখন ঐরূপ ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বিশাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আধুনিক পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধিও স্বভাবতঃই বহুগুণে বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়াছে। ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের সহিত তাহার কয়েক সহস্র নাগরিকের সম্পর্কই এখন আর পৌরবিদ্যার আলোচ্য নয়। বিশাল বিশাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের সহিত উহার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাগকির ও

পৌরবিদ্যার বর্তমান সংজ্ঞা

---

* ইংরেজী Civics কথাটা Civitas ও Civis এই দুই Latin শব্দ হইতে উদ্ভূত। Civitas অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র' এবং Civis অর্থ 'নাগরিক'।

অন্যান্য অধিবাসীদের সম্পর্ক এবং তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কেই আধুনিক পৌরবিদ্যা আলোচনা করে।

পৌরবিদ্যার বিষয়-বস্তু (Scope of Civics): প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন। তাই ব্যক্তিকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই দেখা হইত। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যা-সমূহেই তখন পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রাচীন পৌরবিদ্যার বিষয়বস্তু

কিন্তু আধুনিক নাগরিকের জীবনের পরিধি বহুগুণ বড়। সে কেবলমাত্র এক রাষ্ট্রের সভ্য নহে—সে একাধারে রাষ্ট্রের নাগরিক, নানা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য, নানা সামাজিক সংস্থার সদস্য, বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের এমন কি নিজ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও সভ্য। সুতরাং পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বর্তমানে বহুগুণ বিস্তৃত হইয়াছে।

বর্তমান পৌরবিদ্যার বিষয়বস্তু

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা ও নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত করিয়া রাষ্ট্র নাগরিককে আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়। অতএব রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে আজও প্রধান। কিন্তু বৃহত্তর নাগরিক জীবনের শিক্ষার জন্য বর্তমানে নানা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনাও পৌরবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাছাড়া আজ কোন রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও শান্তি কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রেরই সমৃদ্ধি বা সুখশান্তির উপর নির্ভর করে না, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংকটই আধুনিক নাগরিক জীবনকে অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে (যেমন, কিউবায় রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগ কলিকাতাবাসীর জীবন বিক্ষুব্ধ করে)। তাই আধুনিক পৌরবিদ্যা নাগরিক জীবনের আন্তর্জাতিক দিকও আলোচনা করে।

রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক পৌরবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনাও পৌরবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত

আধুনিক পৌরবিদ্যা নাগরিক জীবনের আন্তর্জাতিক দিকও আলোচনা করে

আধুনিক মানুষ তাহার পূর্ণতম বিকাশের জন্য নানা সেবা বা কৃষ্টিমূলক (যেমন Red Cross Society বা P E N Club, Rotary Club প্রভৃতি)

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের কর্মক্ষেত্র কোন রাষ্ট্রের সীমা দ্বারা সীমিত নয়। এইগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বৈচ্ছিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শগতভাবে পৌরবিদ্যার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, এই সমস্ত মিলনগ্রন্থিকে দৃঢ় করিয়া সর্বমানবীয় ঐক্য ও বিশ্বমৈত্রী স্থাপন করা।

পৌরবিদ্যার আদর্শ-বিশ্বমৈত্রী স্থাপন

আধুনিক কোন রাষ্ট্রের এক নাগরিকের জীবনকে একাধারে স্থানীয় নাগরিকতা (Local or Municipal Citizenship), জাতীয় নাগরিকতা (National Citizenship) এবং আন্তর্জাতিক নাগরিকতা (International Citizenship)—এই তিন অংশে ভাগ করা যায়। আধুনিক মানুষের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য যেমন বদলাইয়াছে তেমনই পৌরবিদ্যা সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুও বদলাইয়াছে। প্রগতিশীল সামাজিক জীবরূপে মানুষের এই সক্রিয় সামাজিক চরিত্র-ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যেদিন পৌরবিদ্যা সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় সূত্রাবলীর কথা মানুষ চিন্তা করিবে, সে দিন সে তাহার প্রগতিশীলতা হারাইবে।

আধুনিক নাগরিকের জীবন তিন অংশে ভাগ

পৌরবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান : পৌরবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় সামাজিক মানুষের আচরণ। সুতরাং পৌরবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের এক শাখা, এবং ইহার অন্যান্য শাখার সহিতও সম্পর্কযুক্ত।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমাজের উৎপত্তি ও সর্বাংগীণ বিকাশ। সামাজিক মানুষের জীবনেরসব দিকই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পৌরবিদ্যায় কেবলমাত্র নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়। সুতরাং মানুষের সমাজ ও সামাজিক মানুষের আচরণ উভয় শাস্ত্রেরই আলোচনার বিষয়বস্তু হইলেও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পৌরবিদ্যার বিষয়বস্তু অপেক্ষা ব্যাপকতর। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য পৌরবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের নিকট ঋণী।

পৌরবিদ্যা সমাজ-বিজ্ঞানের এক শাখা, স্বভাবতঃই ইহার বিষয়বস্তু কম ব্যাপক

(ক) **পৌরবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান** (Civics and Politics) : বিভিন্ন শাখার সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পৌরবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম। উভয়েরই আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সমাজ, রাষ্ট্র ও নাগরিক প্রধান। সুতরাং এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে স্বভাবতই যথেষ্ট মিল আছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র

ব্যাপকতর এবং এই দুই শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থ বিষয়বস্তু পৃথক। পৌরবিদ্যার কেন্দ্রস্থ বিষয় নাগরিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রে আছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় জানা যায় শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ এবং পৌরবিদ্যা জানাইয়া দেয় শ্রেষ্ঠ নাগরিককে।

আলোচ্য বিষয়ে যথেষ্ঠ মিল আছে তবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যাপকতর

(খ) **পৌরবিদ্যা ও অর্থবিদ্যা** (Civics and Economics): অর্থবিদ্যা নাগরিক-সাধারণের অর্থ নৈতিক দিক আলোচনা করে: কিন্তু পৌরবিদ্যায় অর্থ নৈতিক দিক ছাড়া অন্যান্য দিকও আলোচিত হয়। তবে সমাজের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ ও অবস্থা নাগরিক জীবনকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করে। অর্থবিদ্যার মূল সূত্র জানা না থাকিলে নাগরিকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা অসম্ভব। নাগরিকগণ নিজেদের জ্ঞান ও কার্য দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে নাগরিক-সাধারণের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয় না। অনেক সময়, যেমন ভারতের পঞ্চবার্ষিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নীতির ক্ষেত্রে, পৌরবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

অর্থবিদ্যার মূল সূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান নাগরিকের দায়িত্বপালনে সাহায্য করে

(গ) **পৌরবিদ্যা ও ইতিহাস** (Civics and History): ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় মানব সভ্যতার কাহিনী এবং অতীতকালই প্রধানতঃ ইতিহাসের উপজীব্য। অতীতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান আধুনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান বুঝিতে ও ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে বিশেষ সহায়ক। এইভাবে ইতিহাস ও পৌরবিদ্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলেও উহাদের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কিন্তু পৃথক। পৌরবিদ্যা নাগরিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

ইতিহাসের আলোচ্য অতীত, পৌরবিদ্যা নাগরিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়

(ঘ) **পৌরবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র** (Civics and Ethics): মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। আদর্শ নাগরিক মানুষ হিসাবেও আদর্শ হওয়া উচিত এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহেরও একটি নৈতিক ভিত্তি থাকা উচিত — এ কারণে পৌরবিদ্যা নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ মানে। তবে, পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য নাগরিকের বাহ্যিক আচরণ, নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য মানুষের আভ্যন্তরীণ বা নৈতিক আচরণ

নাগরিকের বাহ্যিক আচরণ এবং নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও নৈতিক আচরণ বিচার ও বিশ্লেষণ করে।

পৌরবিদ্যার অনুসন্ধান-প্রণালী : বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানের মতই পৌর-বিদ্যাতেও পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যেই কোন দুইটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। তবে পৌরবিদ্যার সিদ্ধান্ত পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত অভ্রান্ত নয় এবং সে সিদ্ধান্ত ঐরূপ নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। ইহার কারণ, পৌরবিদ্যা নাগরিক হিসাবে মানুষের আচার-আচরণ লইয়া আলোচনা করে। মানুষ ও তাহার আচরণ জড়বস্তুর স্বভাবের মত কোন অভ্রান্ত, সর্বক্ষেত্রে সমান সত্য, স্থির নিয়ম দ্বারা নিয়মিত নয় এবং হইতেও পারে না। মানুষের নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা আছে। একই পরিবেশে বা অবস্থায় মানুষের বিভিন্ন আচরণ সম্ভব

কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

পৌরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ন্যায় অভ্রান্ত নয়

অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের সহিত পৌরবিদ্যার অপর পার্থক্য এই যে কেবলমাত্র তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা নিছক জ্ঞানলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য আদর্শ নাগরিক গড়িয়া তোলা।

পৌরবিদ্যার গুরুত্ব : পৌরবিদ্যার আলোচনা হইতে একজন নাগরিক তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং অপরের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। উক্ত জ্ঞান ও সমাজচেতনা ভিন্ন কোন নাগরিক তাহার অধিকার ভোগ করিতে বা কর্তব্য পালন করিতে পারে না এবং আত্মবিকাশ সাধনেও সমর্থ হয় না। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ স্বাধিকার ও আপন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না হইলে শাসকগোষ্ঠী ক্রমশঃ অত্যাচারী হইয়া উঠে, ফলে কল্যাণধর্মী গণতন্ত্র সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সমষ্টি-গত উভয়বিধ কল্যাণের জন্যই নাগরিকগণের পৌরবিদ্যার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য নাগরিক-গণের পৌরবিদ্যার জ্ঞান একান্ত আবশ্যক

প্রশ্নাবলী

১। পৌরবিদ্যা কি? পৌরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্দেশ কর।
(What is Civics ? Define tbe scope of Civics.)

২। পৌরবিদ্যার সহিত ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার সম্বন্ধ আলোচনা কর।
(Show how Civics is related to History, Politics and Economics.)

৩। পৌরবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Discuss the importance of Civics.)

॥ সমাজ ॥
(Society)

সমাজ কী? (What is Society ?) মানুষ সামাজিক জীব। সংগপ্রিয়তা তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। বিভিন্ন কাজে মানুষ চায় পারস্পরিক সহযোগিতা। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করার, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে-জংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখনও সে বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করিত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জন্তু জানোয়ারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য, আহার্য সংগ্রহের জন্য, সেবা-শুশ্রূষা ও স্নেহ-ভালবাসা পাইবার জন্য সেদিনও মানুষ দলবদ্ধ হইয়াই থাকিত। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতে মানুষ সামাজিক জীব (Man is a social animal.)। স্বভাব-সহজাত সংগপ্রিয়তাই মানুষকে সামাজিক জীব করিয়াছে। তাঁহার মতে মানুষ পরস্পরের সহিত ভাববিনিময়ের জন্যই যেন প্রকৃতির নিকট হইতে বাক্‌শক্তি উপহার পাইয়াছে। কিন্তু সহজাত প্রেরণায় সংঘবদ্ধ হইতে চাহিলেও সব মানুষ সব মানুষের সংগে মিলিতে পারে না বা চাহে না। যাহাদের পারস্পরিক স্বার্থের ঐক্য আছে এবং যাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক তাহারাই একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করে।

স্বাভাবিক সংগপ্রিয়তা মানুষকে সামাজিক জীব করিয়াছে

সুতরাং, সমাজবিজ্ঞান অনুসারে, কোন **বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে সমাজ বলে**। শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় এগুলিও এক একটি সমাজ: কারণ, সমাজের দুই বৈশিষ্ট্য, (ক) সংঘবদ্ধতা ও (খ) বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন—এই দুই ক্ষেত্রেও বর্তমান।

সমাজের ক্রমবিকাশ (Evolution of Society): মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার স্বাভাবিক সংগপ্রিয়তা হইতে এক এক ধরণের সামাজিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তবে মানুষের প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠনের সঠিক রূপ কী ছিল—দল না পরিবার—সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

সামাজিক সংগঠনের ক্রমান্বয়িক রূপ:
(ক) দল বা গোষ্ঠী
(খ) পরিবার

(ক) দল বা গোষ্ঠী (Clan): প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে পরিবারই আদি সামাজিক সংগঠন; কিন্তু আধুনিক লেখকগণ বলেন যে আদিম মানুষ প্রথম

সংঘবদ্ধ হইয়াছিল **দল** বা **গোষ্ঠীতে** (**clan**)। কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে দল বা গোষ্ঠী হইতে **পরিবার** (**family**) গড়িয়া উঠে।

(খ) **পরিবার** (Family) : প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। শিশুরা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই তাহাদের পিতা বা মাতা বলিয়া গণ্য করিত। তবে, শিশু তাহার গর্ভধারিণী মাতার সঙ্গে তাঁহারই স্নেহযত্নে জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটাইত বলিয়া তাঁহাকেই আপনজন মনে করিত এবং বড় হইয়াও মাতৃকর্তৃত্ব স্বীকার করিত। এইভাবে পরিবারে মাতৃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার** (Matriarchal family) গড়িয়া উঠে। একথা মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে মানবসমাজ বিবর্তিত হইয়াছে। সর্বত্র একইভাবে মাতৃতান্ত্রিক ও **পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের** (Patriarchal family) মধ্য দিয়া সমাজের ক্রমবিকাশ হয় নাই। ভারতবর্ষে উভয়প্রকার পরিবারই দেখা যায়। কেরলে এখনও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব বর্তমান। প্রাচীন মিশরে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই পারিবারিক সংগঠনের স্বাভাবিক রূপ ছিল।

দুই প্রকার পরিবার :

মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক প্রথায় বংশ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি মাতার দিক হইতে নির্ণীত হইত। পরিবারের প্রাচীনতমা স্ত্রীলোকের হাতে কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠা কন্যা বা ভগিনীর নিকট কর্তৃত্ব চলিয়া যাইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটি চিহ্ন (এ চিহ্নকে টোটেম 'Totem' বলা হইত) থাকিত।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

ক্রমে মানবসমাজে কৃষিকার্য দ্বারা জীবনধারণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করা হইত, তেমনি ভোগ্য দ্রব্য হিসাবে এইভাবে নারী-ক্রয়ের ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল। যে পুরুষ কোন নারী বা নারীদের ক্রয় করিত, সেই নারী বা নারীরা ঐ পুরুষের স্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হইত। এইভাবে নারী পুরুষের সম্পত্তি হইয়া উঠিল এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হইল। এ জাতীয় পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষেরই সর্বময় কর্তৃত্ব থাকে—বংশের ধারা পুরুষানুক্রমেই হিসাব করা হয়।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

তবে পরিবারের কর্তৃত্ব মাতা বা পিতা যাহারই উপর ন্যস্ত হউক, মূলতঃ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং শিশু রক্ষা ও পালনের উদ্দেশ্যেই পরিবার গড়িয়া উঠে।

যৌথ পরিবার (Joint Family) : ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-রূপে আর এক ধরণের পরিবার দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে স্বামী-স্ত্রী ও তাহাদের পুত্র-কন্যা লইয়া পরিবার গঠিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় যে বিভিন্ন পিতা-মাতার পুত্রকন্যা এক গৃহস্বামীর নেতৃত্বে একান্নবর্তী হইয়া এক পরিবারে বাস করে (যেমন পিতামহ, পিতা-মাতা, জ্যেঠা, কাকা প্রভৃতি)। এরূপ পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। যৌথ ঘরকন্না, যৌথ সম্পত্তি, যৌথ ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতি যৌথ পরিবারের বিশেষত্ব। যৌথ পরিবারের সকলেই যার যার আয় গৃহস্বামীর নিকট সমর্পণ করে এবং তাঁহার ইচ্ছা ও নির্দেশ মানিয়া চলে। এ সমর্পণের প্রতিদানে যৌথ পরিবার পরিবারভুক্ত সকলের ভরণপোষণ এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

যৌথ পরিবার (Joint family)

সুবিধা : যৌথ পরিবারের সুবিধা এই যে, এ ব্যবস্থায় পরিবারের সকলে রোগে-শোকে সমান সেবাযত্ন পায় এবং বেকার, শিশু ও বৃদ্ধের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তা থাকে না। পরিবারভুক্ত কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অসহায় হইয়া পড়িতে হয় না। সমগ্র পরিবারই তাহাদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মোট কথা, যৌথ পরিবার প্রথাকে বেকারী, বার্ধক্য, রোগ, শোক প্রভৃতির বিরুদ্ধে একপ্রকার বীমা-ব্যবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এছাড়া, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ও যৌথ পরিবার প্রথায় অপেক্ষাকৃত কম হয়।

বেকারী, বার্ধক্য, রোগ-শোক প্রভৃতির বিরুদ্ধে বীমা-ব্যবস্থার ন্যায়

অসুবিধা : দায়িত্বজ্ঞানহীন অলস প্রকৃতির ব্যক্তিরা যৌথ পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের বোঝা হয় বলিয়া যৌথ পরিবারে সঞ্চয় থাকে না। আমাদের দেশের মূলধনের স্বল্পতার অন্যতম কারণ যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার প্রথা ব্যক্তি অপেক্ষা পরিবারকে বড় করিয়া দেখিতে ও ভাবিতে শেখায়। সুতরাং, এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির উদ্যম ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিঘ্ন ঘটে। পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসার, অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার প্রথা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

সঞ্চয়ে অসুবিধা

ব্যক্তির উদ্যম ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বাধাস্বরূপ

বাজার ও নগরের পত্তন : কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে মানুষ খাদ্য আহরণকারীর (food gathering) স্তর (যে অবস্থায় সে খাদ্য উৎপন্ন করিত না, ফলমূল আহরণ করিয়া, মাছ ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত) হইতে খাদ্য-উৎপাদনকারীর (food producing) স্তরে উন্নীত হয়। কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে স্থায়ী বসবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করিতে লাগিল। এ ভাবে মানুষের যাযাবরত্বের অবসান হইল ও গ্রাম্য-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। গ্রাম্যসমাজে যথাকালে শ্রমবিভাগ ও বিনিময় সুরু হইল। বিনিময়ের নির্দিষ্টস্থানে বাজার (market) গড়িয়া উঠিল এবং বহু ক্ষেত্রে বাজারকে কেন্দ্র করিয়া নগরের (city) পত্তন হইল। গ্রাম্যজীবন কোন সমিতি বা পঞ্চায়েতের নির্দেশে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক গৃহস্বামী পঞ্চায়েতের সভ্য হইতেন। কালক্রমে সামাজিক জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক নিয়মকানুন রচিত হইল।

খাদ্য-আহরণকারীর স্তর হইতে খাদ্য-উৎপাদনকারীর স্তরে উন্নীত

শ্রমবিভাগ ও বিনিময় প্রথার প্রচলন

(গ) উপজাতি (Tribe) : কালক্রমে এইরূপ (শ্রমবিভাগ, বিনিময়, ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক নিয়মকানুন ইত্যাদি উদ্ভবের ফলে) সমাজ, গোষ্ঠী ও পরিবার-এর স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ যে স্তরে উপনীত হইল তাহাকে উপজাতি (tribe) বলা হয়। এক উপজাতি অপর উপজাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিতে লাগিল। যুদ্ধবিগ্রহ উপজাতির স্তরের বৈশিষ্ট্য। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে যে-সমস্ত নায়ক অপূর্ব রণকৌশল ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত, স্ব স্ব উপজাতির লোকেদের নিকট তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিত। এইভাবেই এক একজন সমর-নায়ক এক একটি উপজাতির নেতৃত্ব লাভ করিত। ক্রমে সমস্ত ক্ষমতা তাহাদের করায়ত্ত হইত। এইরূপেই যুদ্ধের সাফল্য হইতে নায়কেরা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইত (war begat kings)।

যুদ্ধবিগ্রহ

সমর নায়কের রাজপদ লাভ

(ঘ) রাষ্ট্র (State) : ক্রমে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি—রাজার বিধান ঈশ্বরের বিধান—এরূপ ধারণা সমাজে প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে লাগিল। জনসাধারণ ঈশ্বরের বিধান মনে করিয়া রাজার বিধান মানিতে লাগিল। এইভাবে রাজার সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, রাজার বিধান বা আইন প্রজাদের আনুগত্য

রাজার সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

লাভ করিল, সামাজিক সংহতি দৃঢ়মূল হইল। ক্রমে এই সামাজিক সংহতি রাষ্ট্র-রূপ (State) ধারণ করিল।

(ঙ) **জাতীয় রাষ্ট্র (National State)**ঃ কালক্রমে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্রে (National State) পরিণতি লাভ করে। জাতীয় রাষ্ট্র হইতে নানা জাতির সমন্বয়ে ও সমবায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N.) মাধ্যমে এক বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা আধুনিক মানুষের মনে বাসা বাঁধিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন

সমাজ ও ব্যক্তি (Society and the Individual)ঃ আদিকাল হইতে সমাজ-বিবর্তনের যে-কোন স্তরেই দেখা যাইবে যে মানুষ তাহার জীবনকে নিরাপদ ও সুস্থ করিয়া তাহার জীবনের পূর্ণ ও সুন্দর বিকাশের জন্যই সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রয়াস করিয়াছে এবং ক্রমশঃ পূর্ণতর জীবনানুসন্ধানই সমাজ-বিবর্তনের মূল কারণ।

নিরাপদ, সুস্থ, সুন্দর ও পূর্ণ জীবনের অনুসন্ধানই সমাজ-বিবর্তনের মূলে রহিয়াছে

এককালে কাহারো কাহারো মনে ধারণা ছিল যে সমাজের বিধিনিষেধ ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূল, যেহেতু সমাজের শাসন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত করে। তবে এখন আর এ ধারণার সমর্থন নাই। ব্যক্তিকে লইয়া ব্যক্তির জন্যই সমাজ। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ অভিন্ন। কোন অবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ পরস্পর-বিরোধী হইলে সে সমাজে বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে বুঝিতে হইবে।

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ পরস্পর-সাপেক্ষ

সমাজের বিধিনিষেধ সমাজের সংহতি এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সমন্বয় সাধনের জন্য রচিত। এই সমস্ত বিধিনিষেধের ফলে সকলেরই মংগল হয়। ইহা কতিপয় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করে, কাহারো স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, সমাজস্থ সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সাম্য সকলের পক্ষে আত্মবিকাশের সুযোগ অবারিত করে এবং সমাজে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে, সমাজ উন্নতির পথে চলে।

সমাজের বিধিনিষেধ সামাজিক মানুষের কল্যাণেরই জন্য

সমাজ শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ও সমান সুযোগ দিয়া যেমন ব্যষ্টির আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়, তেমনই ব্যষ্টিকেও তাহার চিন্তা ও কার্য দ্বারা

সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়—ব্যষ্টি-স্বার্থকে সমষ্টি-স্বার্থের অধীন করিতে হয়। সুস্থ নাগরিক চেতনা সমাজচেতনার উন্নতি বিধান করে।

সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ব্যক্তিচরিত্র জাতীয় চরত্রের প্রধান উপাদান। স্বাধীন ভারতের বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ত্রুটি দূর করিতে হইলে ভারতের জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং এই বিষয়ের প্রধান দায়িত্ব কেবল ভারত সরকারের নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর।

প্রশ্নাবলী

১। 'সমাজ' বলিতে কী বোঝ? সমাজ-বিবর্তন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(What do you understand by the term 'Society'? Trace the evolution of Society).

২। পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক ও যৌথ পরিবার সম্বন্ধে টিপ্পনী লিখ।

(Write short notes on—(a) Matriarchal Family, (b) Patriarchal Family, and (c) Joint Family).

৩। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনা কর।

(Discuss the relation between Society and the Individual).

রাষ্ট্র
(The State)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State) : মানব সমাজের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া মানব সমাজ যে সর্বোত্তম স্তরে উপনীত হয় তাহাই রাষ্ট্র। একক অসংহত বিশৃংখল প্রচেষ্টায় মানুষের পক্ষে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। রাষ্ট্রব্যবস্থাধীন হইলেই মানুষের চরম আত্মবিকাশ সম্ভব।

অধ্যাপক গার্নার (Garner)-এর মতে, "রাষ্ট্র হইল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্থায়ী অধিবাসী এক জনসমাজ, যাহা কোন প্রকার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বথা বা প্রায়-সর্বথা মুক্ত, যাহার এক সুগঠিত শাসনব্যবস্থা আছে এবং সেই শাসনব্যবস্থার আনুগত্য জনসমাজের অধিকাংশ স্বভাবতঃই স্বীকার করে।" ("A State is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of a territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.") মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)-ও রাষ্ট্রের অনুরূপ সংজ্ঞাই দিয়াছেন। তাঁহার মতে, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী, আইনানুগ ও সুগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র।" ("A State is a people organised for law within a definite territory.")

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State) : উপরের সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকিতেই হইবে—(ক) জনসমষ্টি (Population), (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Fixed Territory), (গ) সরকার (Government) এবং (ঘ) বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)।

মানব সমাজের নানা বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কখনও জনসমষ্টি বা জনসমাজ ছাড়া হইতে পারে না। তবে রাষ্ট্রের

জনসমষ্টি

জনসংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই (অর্থাৎ এত কম বা এত বেশী জনসংখ্যা হইলে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইবে না—এমন নহে)। আধুনিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসংখ্যার বিভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে।

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অধিকার নাই এমন জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নয়। বেদুইন বা অন্য কোন যাযাবর জনসমাজকে রাষ্ট্র বলা যায় না। এ কারণেই সুসভ্য ইহুদীরা যতদিন ইস্রাইলে (প্যালেস্টাইনে) স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নাই ততদিন তাহাদের রাষ্ট্র বলিতে কিছু ছিল না। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সমুদ্রোপকূলস্থ নির্দিষ্ট কিছু জলভাগ (সাধারণতঃ উপকূল হইতে ৩ মাইল) ও রাষ্ট্রের ভূভাগের উপরস্থ বায়ুমণ্ডলও রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্গত। রাষ্ট্রাধীন জনসমষ্টির মতই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্থায়ী অধিবাসীদের সুশৃংখল ও সংহত করিয়া তোলার জন্য একটা শাসনব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। নচেৎ শাসনব্যবস্থার অভাবে জনসমষ্টি বিশৃংখল জনতায় পরিণত হয়। এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাদের সম্মিলিত রূপকেই বলা হয় **সরকার**।

সরকার

রাষ্ট্র একটা ধারণা মাত্র, সরকার রাষ্ট্রের মূর্ত রূপ। তাই, সাধারণতঃ সরকারকেই রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করা হয়। প্রকৃত পক্ষে সরকার রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান এবং এক নির্দিষ্ট অংশ। রাষ্ট্রের পরিচালনা ও রাষ্ট্রশাসনের ভার থাকে যে সমস্ত নাগরিকের হাতে তাহাদের সংগঠন বা মিলিত রূপকেই বলে সরকার। সরকার মারফত রাষ্ট্র উহার সমস্ত ইচ্ছা ও বিধিনিষেধ (অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত আইনকানুন) প্রকাশ ও প্রয়োগ করে।

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উহার সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে এই বুঝায় যে রাষ্ট্র আপন এলাকার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা বাহিরে এমন কোন শক্তি বা সংগঠন থাকিবে না যাহা উহার ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য উহার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

সার্বভৌম ক্ষমতা

তবে এ সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন একটি রাষ্ট্রকে যতদিন অন্য কতকগুলি রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া না লয়, ততদিন আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে তাহা রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে না।

বহিঃরাষ্ট্রের স্বীকৃতি

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারত কি রাষ্ট্র ছিল? (Was India a State before August 15, 1947?): স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও আমাদের দেশে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী অধিবাসী, জনসমষ্টি ও সুগঠিত এক সরকার ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলিয়া ১৫ই অগস্ট ১৯৪৭-এর আগে ভারতবর্ষ রাষ্ট্র-বলিয়া পরিগণিত হইত না। ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট ভারতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে এবং ১৯৪৭-এর ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ নিজেকে এক সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন বহিঃরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করায় আন্তর্জাতিক আইনের সূক্ষ্ম বিচারে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয়।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (The State and other Associations): পূর্বে বলা হইয়াছে যে আধুনিক কোন রাষ্ট্রের নাগরিক একই সংগে রাষ্ট্রাধীন এবং রাষ্ট্র-বহির্ভূত নানা সংঘের সভ্য হইতে পারে ও হয়। অন্যান্য বিভিন্ন সংঘের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য আলোচনা করিলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ উপলব্ধির সাহায্য হইবে।

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্র এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে। কিন্তু অন্যান্য সংঘের কোন ভৌগোলিক সীমা নাই। জগদ্বিখ্যাত সেবা প্রতিষ্ঠান রেড্ ক্রস্ সোসাইটি-র কর্মক্ষেত্র প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্য এ সংস্থার সভ্য হইতে পারে।

(২) রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাধ্যতামূলক—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। অন্যান্য সংঘের সভ্য হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।

(৩)। একই সংগে কোন ব্যক্তি একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে কিন্তু একই কালে কোন ব্যক্তি দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না।

(৪) স্থায়িত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্র সুচিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের তুলনায় অন্য যে কোন সংঘ স্বল্পস্থায়ী। যে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন সংঘ গড়িয়া উঠে তাহা সফল হইলে বা অন্য নানা কারণে সংঘ উঠিয়া যাইতে পারে।

(৫) রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাহিরে রাষ্ট্র স্বাধীন, অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং এক

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য সকল সংঘ বা সংস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্র যে কোন সংঘ উঠাইয়া দিতে পারে।

(৬) বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নাগরিকগণের সর্বাংগীণ মংগল ও উন্নতিসাধন করা। সুতরাং, রাষ্ট্র নাগরিক জীবনের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ও করে।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government): রাষ্ট্র এক ভাবমূর্তি আর সরকার তাহার প্রত্যক্ষ রূপ। রাষ্ট্র সমগ্র আর সরকার তাহার এক প্রধান অংশ—রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা বিধিনিষেধের প্রকাশ ও প্রয়োগ এক অতি শক্তিশালী অংশ।

রাষ্ট্র সমগ্র, সরকার অংশ মাত্র

রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সরকারের স্থায়িত্ব অপেক্ষা দীর্ঘতর। দৃষ্টান্ত হিসাবে চীনের উদাহরণ দেখা যাক: চীনে যতদিন চিয়াংকাইশেক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন চীন-সরকারের রূপ ছিল একরকম; তারপর মাও-সে-তুং যখন সর্বপ্রধান ক্ষমতার অধিকারী হইলেন তখন সরকারের রূপ বদলাইয়া গেল। কিন্তু চীন-রাষ্ট্রের রূপ অভিন্নই রহিয়া গেল। সরকারের রূপের মত রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তনশীল নয়। শুধু, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের দখলে গেলে, কিংবা কোন দৈবদুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়া গেলে, অথবা ঐরূপ কোন অসাধারণ কারণ ঘটিলেই রাষ্ট্রের রূপ বদলায়—রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্ব নষ্ট হয়। কিন্তু সরকারের অদল-বদল যে কোন সময় হইতে পারে, বিশেষতঃ, সে সরকার যদি দলীয় মন্ত্রিসভার দ্বারা গঠিত ও নিয়মিত অনুষ্ঠিত নির্বাচন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়।

সরকার অপেক্ষা রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী

দেশের সমস্ত নাগরিক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়; কিন্তু রাষ্ট্রের যে কয়জন নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের পরিচালনা ও শাসনের ভার ন্যস্ত থাকে তাহাদের সংগঠন বা মিলিত রূপকেই সরকার বলে।

সরকার নাগরিকদের বিশেষ এক অংশকে লইয়াই গঠিত

গঠনের দিক হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সব রাষ্ট্রই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি উপাদানে গঠিত। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের মধ্যে গঠনতন্ত্রে পার্থক্য থাকে ও আছে। কোন রাষ্ট্রে শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বা আছে একজন রাজা বা নায়কের হাতে, আবার কোথাও বা ন্যস্ত আছে নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

গঠনের দিক দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র অভিন্ন, কিন্তু সরকার বিভিন্ন

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অধিকার কোন নাগরিকের বা প্রজার নাই বা থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিক এবং প্রজার অধিকার থাকার অর্থ নিজেদের বিরুদ্ধেই অধিকার থাকা। কিন্তু কোন সরকার অত্যাচারী বা অন্যায়কারী হইলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার এমন কী সেই সরকারকে উচ্ছেদ পর্যন্ত করিবার অধিকার নাগরিকদের আছে।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকার থাকিতে পারে না

রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। সেগুলির একটিই কেবল বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, অপরগুলি কল্পনা-প্রসূত। এখানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধান মতবাদগুলি আলোচনা করা হইতেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (The Theory of Divine origin): কল্পনা-প্রসূত মতবাদসমূহের মধ্যে **ঐশ্বরিক উৎপত্তির মতবাদ (The theory of Divine Origin)** প্রাচীনতম। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরসৃষ্ট এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাজার আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ, সে আদেশ-লংঘন করা পাপ।

য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষের রাজারাও নিজেদের সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতার বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

সমালোচনা: বর্তমানে এ মতবাদের কোন সমর্থন নাই। পরন্তু এই মতবাদ মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া নিন্দিত। কারণ, এই মতবাদ অনুসারে প্রজার প্রতি রাজার কোন দায়িত্ব নাই এবং প্রজার কোন অধিকার নাই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। মধ্যযুগের শেষে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই মতবাদ রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচারী ও কলহপ্রিয় করিয়া তুলিয়া প্রজাদের শান্তিভংগের কারণ হইয়াছিল।

মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর

এ মতবাদের অসারতার সংগে ইহার অসম্পূর্ণতাও লক্ষণীয়। এ মতবাদ রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শক্তির মূল কোথায় সে বিষয়ে কোন সন্ধান দিতে পারে না। ইংলণ্ডের রাণী ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু কোন প্রজাতন্ত্রের (যেমন ভারতবর্ষে) যিনি প্রধান তিনিও ঈশ্বরের প্রতিনিধি কিনা সে সম্পর্কে এ মতবাদ নীরব।

অসার ও অসম্পূর্ণ মতবাদ

তবে, রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন জনসমাজকে এ মতবাদ অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়ত আইন ও শৃংখলা মান্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, হয়ত রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া প্রজাদের মংগলসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এভাবে এ মতবাদে কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে।

মতবাদের মূল্য

(খ) **বলপ্রয়োগ মতবাদ (The Theory of Force)**ঃ কাহারো কাহারো মতে রাষ্ট্র বাহুবল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ মতবাদ **বলপ্রয়োগ মতবাদ (The Theory of Force)** নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে, মানুষের স্বাভাবিক কলহপ্রিয়তা ও ক্ষমতালিপ্সা বশতঃ কোন বলবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী (clan) অন্যান্য কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া তাহাদের উপর আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে উপজাতির (Tribe) উদ্ভব হয়। পরস্পর বিবদমান উপজাতিসমূহের মধ্যে কোন শক্তিশালী উপজাতি অন্যান্য উপজাতিকে পরাস্ত করিয়া বিজিতদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। বিজয়ী উপজাতির দলপতি বিজিতদের রাজা বা নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। শুধু রাষ্ট্র সৃষ্টিতে নয়, রাষ্ট্র শাসনে এবং রক্ষায়ও বলপ্রয়োগ প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তিকে মান্য করিত রাষ্ট্রের শক্তি অধিক বলিয়া। এভাবে, এ মতবাদ অনুসারে, রাষ্ট্রের জন্ম ও স্থায়িত্ব কেবলমাত্র বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রের জন্ম ও স্থায়িত্ব বলের উপর প্রতিষ্ঠিত

আলোচনাঃ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বাহুবলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিলেও একমাত্র বলপ্রয়োগেই রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। মানুষের স্বাভাবিক সংগপ্রিয়তা, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পদ প্রভৃতিও নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভবে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সুতরাং, বলপ্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র হইতে পারে। তা ছাড়া, কেবল বলপ্রয়োগ বা শাস্তির ভয় দেখাইয়া রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বা নিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে না। রাশিয়ার জার (Czar)-এর শাসন বা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে অস্ত্র, সৈন্য আর পুলিশ রাষ্ট্রের শান্তি বা স্থায়িত্ব রক্ষা চিরদিন করিতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব, শান্তি আর শক্তি নির্ভর করে জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থনের উপর—বাহু বলের উপর নহে।

অন্যান্য সক্রিয় কারণ

জনগণের ইচ্ছার উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন (Green)-এর মতে, বলের উপর নয়, জনগণের ইচ্ছার উপরই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ("Will, and not force, is the basis of the State.")।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (**Social Contract Theory**) : সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক পণ্ডিতের মতে এক সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। এই মতবাদ **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (**Social Contract Theory**) নামে পরিচিত।

প্রাকৃতিক অবস্থা

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে মানুষ এক প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of Nature) বাস করিত। তবে তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে এ মতবাদের প্রধান তিন ভাষ্যকার—ইংরাজ দার্শনিকদ্বয় **হব্‌স্‌** (Hobbes) ও **লক্‌** (Locke) এবং ফরাসী দার্শনিক **রুশো** (Rousseau)—ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন।

হব্‌সের মত

হব্‌সের মতে সে অবস্থায় মানুষে মানুষে বিরোধ আর সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন নৈতিক বা আইনগত বাধানিষেধ ছিল না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু ছিল—প্রত্যেকে প্রত্যেককে এড়াইয়া চলিত। সুতরাং জীবন ছিল নিঃসংগ, দীন, অপরিচ্ছন্ন, পশুবৎ এবং স্বল্পস্থায়ী ("solitary, poor, nasty, brutish and short")। এ জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিলে মানুষ এক সামাজিক চুক্তি করিয়া সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের (assembly of men) হাতে। ক্রমে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হয় এবং সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণে সুসংবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ-জীবন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

লকের মত

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় এক প্রকার সমাজ-জীবন ছিল। সে জীবনে ছিল শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইত এক সহজ ন্যায়বোধের শাসনদ্বারা। কিন্তু কোন আচরণ সেই সহজ ন্যায়বোধদ্বারা সমর্থিত আর কোন আচরণ সমর্থিত নয়, এ বিষয়ে কোন নির্দেশ ছিল না বা এরকম কোন বিরোধস্থলে নীতি ব্যাখ্যা করার বা নীতিভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ইহার ফলে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটে এবং নিরাপত্তার জন্যই মানুষ এক সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। চুক্তির

এক পক্ষ ছিল জনসমাজ এবং অপর পক্ষ ছিল প্রধান বা রাজা বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তি। তবে রাজা চুক্তিভংগ করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করার অধিকার জনসাধারণের থাকিত।

রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সহজ, সরল, সুস্থ ও সুন্দর এবং সমাজ ছিল সম্পূর্ণ সাম্যবাদী। ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই সর্বাংগসুন্দর জীবনে ব্যাঘাত আসিল এবং মানুষের অবস্থা হব্‌স-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত হইয়া উঠিল। মানুষ সেই অসহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের উপর ন্যস্ত হইল না—ক্ষমতা ন্যস্ত হইল চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট সমাজের উপর। রুশোর মতে সমাজ প্রতিটি সার্বভৌম ব্যক্তির মিলিত ইচ্ছাশক্তির (General Will) উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের মাধ্যমে পূর্বের অসংবদ্ধ সমাজ সাধারণের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা গঠিত সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

রুশোর মত

সমালোচনা ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের পিছনে ইতিহাসের কোন সমর্থন নাই। কোন দেশের ইতিহাসেই কোন প্রমাণ নাই যে আদিম মানুষ একদিন হঠাৎ এক পারস্পরিক চুক্তির দ্বার রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে।

অনৈতিহাসিক মতবাদ

চুক্তির দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত নয়। চুক্তি একটি আইনগত বিষয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা ও নির্দেশই আইনরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র গঠনের পূর্বেই রাষ্ট্র-চেতনাহীন মানবসমাজ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে আদিম মানুষের কোন ধারণাই ছিল না, সে সব মানুষের পক্ষে রাষ্ট্র-পরিকল্পনা বা রাষ্ট্রের উপযোগিতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাই আদিম মানুষ তাহার দুঃসহ জীবনের অবসানের জন্য রাষ্ট্রসৃষ্টির উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল —এমন মতবাদ অযৌক্তিক।

অযৌক্তিক মতবাদ

তাছাড়া, এ মতবাদ রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের বা শাসক-শাসিতের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল। নাগরিকেরা যদি মনে করে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই সৃষ্ট, তবে কোন স্থায়ী শাসন পরিচালনা অসম্ভব এবং শাসিতেরা সর্বদা শাসকদের ছিদ্রান্বেষণ করিবে। ফলে, অকারণে প্রায়ই বিপ্লবের আশংকা থাকিবে।

বিপজ্জনক অবস্থা

এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই মতবাদ হইতেই জনগণের মনে আধুনিক গণতন্ত্রের এ ধারণা আসিয়াছে যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগতভাবে কতিপয়ের হাতে থাকিলেও, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের হাতে ন্যস্ত এবং সরকার জনগণের নিকট দায়ী। অতএব, পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী রাজাদের ঈশ্বরের দূতরূপে প্রজাপীড়নে নেতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এই মতবাদ আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অনেকের ধারণা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইতিহাসে জনজাগরণের যে দুইটি উদাহরণ পাওয়া যায় ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে, তাহার নেতাগণ সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

গণতন্ত্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় ইহার মূল্য

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory)ঃ পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নহে বা শুধু পশুবলের সাহায্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি। তবে তাহা কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা চুক্তির দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করে নাই। আদিম মনুষ্যসমাজ বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান রাষ্ট্ররূপ লাভ করিয়াছে। গোষ্ঠী, পরিবার (মতান্তরে পরিবার, গোষ্ঠী), উপজাতি ও রাষ্ট্র মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে এই আধুনিক মতবাদ **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ** (**Historical or Evolutionary Theory**) নামে অভিহিত।

রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরামহীন বিবর্তনের ফল

মনুষ্যসমাজের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার মূলে কয়েকটি শক্তি বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল। সেগুলি হইল **রক্তের সম্বন্ধ** (**kinship**), **ধর্ম** (**religion**), **অর্থনৈতিক প্রয়োজন** (**economic needs**) এবং **শৃংখলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা** (**need of order and security**)।

রক্তের সম্বন্ধ বহু ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং একই রক্তের সম্পর্কযুক্ত বহু পরিবার গোষ্ঠীতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। আবার বহু গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হইয়া উপজাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এইভাবে ~~রাষ্ট্রের~~ রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতেই

রক্তের সম্বন্ধ

আদিম সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং সেই সমাজই কালক্রমে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মনুষ্য সমাজে ঐক্যের দ্বিতীয় বন্ধন **ধর্ম**। ধর্ম মানুষকে মান্য করিতে শিখাইয়াছে। আদিম যুগে মানুষ রাজাকে মানিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া এবং আইনকে মানিত ঈশ্বরেরই নির্দেশ বলিয়া। এই মান্য করার শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলেই মানুষ শাসন স্বীকার করিয়াছে।

ধর্ম

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে **অর্থনৈতিক প্রয়োজনের** তাগিদেই মনুষ্যপরিবার উপজাতিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং উহা কালক্রমে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। আহার, আচ্ছাদন ও বাসস্থানের প্রয়োজনে (এ সকলের সংগ্রহ বা নির্মাণ কোন এক ব্যক্তি বা কোন একটি পরিবারের পক্ষে চিরকালই দুঃসাধ্য) মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন

রাষ্ট্রের সম্বন্ধে, ধর্মের বন্ধনে ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে বহু মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ার পর এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পদের উদ্ভবের পর সংঘবদ্ধ মানুষ **আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও ধনপ্রাণের নিরাপত্তার** প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। বহিরাক্রমণের আশংকাও বর্তমান ছিল। তাই শৃংখলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ফলে সমাজ বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ হইল এবং এক শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ও উদ্ভব হইল। ইহাই রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা, এবং আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এইভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এই মতবাদই সর্বজনগ্রাহ্য, কারণ ইহা বিজ্ঞান-সম্মত বহু যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শৃংখলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য (Purposes and Functions of the State):

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে রাষ্ট্র এক প্রাণহীন জড়যন্ত্র মাত্র নয়—রাষ্ট্র একটা জীবন্ত সুসংগঠিত একক, মানুষের সামাজিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। রাষ্ট্র উদ্দেশ্যবিহীন জনসংগঠন নয়। ইহার আদর্শ মহান এবং উদ্দেশ্য জনকল্যাণ-সাধন।

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য—ইহার শাসনাধীন জনসমাজের মধ্যে সুখসমৃদ্ধি, শান্তি, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে।

সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—শাসনাধীন জনসমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সমষ্টিগতভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করা।

বিভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান

প্রত্যেক রাষ্ট্রই সারা পৃথিবীর জনসমাজের অংশ। সুতরাং, সমগ্র জগতের উন্নতিবিধান ও কল্যাণসাধনে কার্যকর অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বাঞ্ছনীয় আদর্শ।

সর্বজনীন কল্যাণসাধন

রাষ্ট্রের কর্তব্য—কিন্তু রাষ্ট্র কীভাবে তাহার উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সফল করিয়া তুলিবে, কোন্ পথে আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হইবে, তাহার সংগে নাগরিক ও প্রজাদের কী সম্পর্ক হইবে—এ বিষয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা একমত নহেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের (**Individualists**) মতে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ হইবে শুধু রক্ষামূলক, অর্থাৎ পুলিশের কাজ। ব্যক্তির বিকাশ যেন কোনমতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য সৈন্যদল গঠন করিবে এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুলিশবাহিনী প্রস্তুত রাখিবে।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ জনরক্ষামূলক

রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদীদের (**Statists or Socialists**) মতে পুলিশের কাজই রাষ্ট্রের একটিমাত্র বা প্রধানতম কাজ নয়, উহা রাষ্ট্রের বহুবিধ কাজের একটি মাত্র। সমস্ত নাগরিকের সমভাবে কল্যাণসাধন এবং সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনই আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইঁহাদের মতে, ব্যক্তিগতভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রসভ্যদের সর্বথা কল্যাণ ও উন্নতিসাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে রাষ্ট্রের এদিকে যত বেশী লক্ষ্য সেই রাষ্ট্র তত বেশী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ জনকল্যাণমূলক

রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদীদের মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ঝোঁক দিলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রে নাগরিকদের এক বিশেষ দলের কর্তৃত্ব প্রধান হইয়া উঠে এবং এই দলের কর্তৃত্বের ফলে অন্যান্য নাগরিকদের স্বার্থ ও অধিকার বিপন্ন হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কুফল

অপর পক্ষে, রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের চাপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়, সে রাষ্ট্রচালিত যন্ত্রে পরিণত হয় এবং তাহার আভ্যন্তরীণ সুপ্ত সম্ভাবনা প্রবুদ্ধ হয় না।

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের কুফল

আধুনিক পৃথিবীতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদের দিকেই বেশী ঝোঁক দেখা যায়। রাষ্ট্রের সভ্যেরা যাহাতে সমানভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারে, যাহার যেদিকে প্রবণতা সেদিকেই তাহার যথোপযুক্ত বিকাশ হয়, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যাহাতে দেশের উন্নতি হয় এবং সে উন্নতির সুফল সমস্ত দেশবাসীই সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, শিক্ষা স্বাস্থ্য আহার ও বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সকলে সমান অধিকার ভোগ করিতে পারে, দেশে কেউ বেকার না থাকে, দেশে দুর্ভিক্ষ বন্যা মহামারী প্রভৃতি বিপদ যাহাতে না ঘটে, দেশের অভ্যন্তরে কোন বিরোধ না দেখা দেয়, বহিরাক্রমণ যাহাতে দেশের শান্তি ও উন্নতি ব্যাহত করিতে না পারে, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা (অর্থাৎ জনগণের শুভ-বিধায়ক নানা কাজ করাই) বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। পুলিশ রাষ্ট্র এখন আর আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য নয়, জনসাধারণের হিতকামী **কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই** (**Welfare State**) বর্তমানে আদর্শ রাষ্ট্র।

জনহিতৈষী কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক পথে থাকিয়া নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করিতেছে, অপর পক্ষে আবার ব্যক্তির পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য উন্নয়নমূলক তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছে। এই কারণে ভারত আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় কর ও রাষ্ট্রের বিশেষত্বসমূহ আলোচনা কর।

[**Define State and discuss its characteristics.**]

২। (ক) রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ, এবং (খ) রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য বর্ণনা কর।

[Distinguish State (i) from other Associations, (ii) from Government.]

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর ও সঠিক মতবাদ নির্ণয় কর।

[Discuss, in brief, the different theories about the origin of the State and analyse the correct theory.]

৪। 'রাষ্ট্র পশুশক্তি প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত।'—এ মতবাদ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা কর।

["The State is based on Force."—Discuss.)

৫। "বলের উপর নহে, জনগণের ইচ্ছার উপরই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত।"—এ উক্তি আলোচনা কর।

["The State is based not on Force but on General Will."—Discuss.]

৬। রাষ্ট্রের উৎপত্তির সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধে যে-সব মতবাদ আছে, উহা আলোচনা কর।

[Discuss the Social Contract theory of the origin of the State.]

৭। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্তব্যাবলী বর্ণনা কর।

(Describe the objects and functions of the State.)

॥ সরকারের বিভিন্ন রূপ ॥

(Different Forms of Government)

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সরকারের রূপবিশ্লেষণ চেষ্টার ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ প্রাচীনতম। দুই নীতি অনুসারে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁহার প্রথম নীতি, রাষ্ট্রশাসনের উদ্দেশ্য বিচার করা। জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য পরিচালিত সরকার তাঁহার মতে স্বাভাবিক (Normal) এবং ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত সরকার তাঁহার মতে বিকৃত (Perverted)।

অ্যারিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগ (Aristotle's classification)

তাঁহার অপর নীতি, সরকারের চরম ক্ষমতা কত জনের উপর ন্যস্ত তাহার বিচার করা। শাসন-ক্ষমতা যদি একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য শাসন পরিচালনা করেন, তবে সেই স্বাভাবিক সরকারের নাম **রাজতন্ত্র** (**Monarchy**)। রাজতন্ত্রের বিকৃতি ঘটে যখন কোন ব্যক্তি শাসনক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের জন্য শাসন পরিচালনা করেন। রাজতন্ত্রের সেই বিকৃত রূপকে বলা হয় **স্বৈরাচারতন্ত্র** (**Tyranny**)। কতিপয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যখন জনকল্যাণে শাসন পরিচালনা করেন তখন সে সরকারকে বলা হয় **অভিজাততন্ত্র** (**Aristocracy**) এবং অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসন পরিচালনা করেন, তাহাকে বলে **ধনিকতন্ত্র** (**Oligarchy**)। জনকল্যাণে বহু লোক দ্বারা পরিচালিত সরকারকে অ্যারিস্টটল **পলিটি** (**Polity**) এবং পলিটির বিকৃত রূপকে **গণতন্ত্র** (**Democracy**) সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে গণতন্ত্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠ বিত্তহীনেরা ধনীদের এবং বুদ্ধিজীবিদের উপর অত্যাচার করে। সুতরাং এ ধরনের শাসন সর্বজনকল্যাণপ্রসূ হয় না।

অ্যারিস্টটল-এর মতে সরকারের বিভিন্ন রূপ

শাসক	স্বাভাবিক	বিকৃত
একজন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
কয়েকজন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজন	পলিটি	গণতন্ত্র

সমালোচনা—অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ তাঁহার সমকালীন সরকারসমূহ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও আধুনিক যুগে প্রযোজ্য নহে। আধুনিক সরকারসমূহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে মিশ্র ধরণের—অবিমিশ্র রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা পলিটি (অবিকৃত গণতন্ত্র) বর্তমানে দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় রাণী রাজতন্ত্রের প্রতীক, হাউস্ অফ লর্ডস (House of Lords) অভিজাততন্ত্রের প্রতীক এবং হাউস্ অভ কমনস্ (House of Commons) গণতন্ত্রের প্রতীক। আধুনিক এককেন্দ্রিক (Unitary) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসন-ব্যবস্থার স্থান অ্যারিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগে নাই।

বর্তমান কালে প্রযোজ্য নহে

তবে কোন সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য পরিচালিত কিনা, এ নৈতিক বিচার আজও করা হয়, এবং এই বিচারে কোন কোন রাষ্ট্রকে পুলিসী বা জংগী রাষ্ট্র এবং কোন কোন রাষ্ট্রকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সরকারের রূপ মোটা-মুটি দুইরকম—**গণতন্ত্র (Democracy)** এবং **একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)**।

আধুনিক বিভাগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জনদরদী রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln)-এর মতে আধুনিক গণতন্ত্র হইল **জনগণের হিতার্থে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন (Government of the people, by the people and for the people)**।

গণতন্ত্র বা জনতার সরকার

যে ধরণের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত সভ্যই (অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ বা গুরু অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ ছাড়া) রাষ্ট্রশাসনের কাজে সামান্য হইলেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা হয়। এ জাতীয় সরকারকে জনসমষ্টির অধিকাংশের আস্থাভাজন হইতে হয় বলিয়া গণতান্ত্রিক সরকারকে জনতার সরকারও (Popular Government) বলা হয়।

বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে অধিবাসী-সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বলিয়া সমস্ত নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র শাসনে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই, আজকাল প্রতিনিধি মারফতই নাগরিকেরা রাষ্ট্রশাসনের কাজে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আধুনিক গণতন্ত্র বলিতে **পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy) বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা (Representative**

Government) বোঝায়। প্রাচীন গ্রীসে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিত এবং সেকালে সেই সমস্ত নগর-রাষ্ট্রে **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Pure or Direct Democracy)** সম্ভব ও প্রচলিত ছিল।

আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধিদের মারফতই নাগরিকরা তাহাদের মতামত প্রকাশ করে। তাই আজকাল 'জনগণ কর্তৃক শাসন' বলিতে জনমত কর্তৃক শাসনই বুঝায়। এই জনমত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। জনতার সরকার গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময় পর পর সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে এবং নির্বাচনের সময় নাগরিকরা ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। কোন নির্দিষ্ট এলাকার (Constituency) অধিকাংশ ভোটদাতার ভোট বা নির্বাচন যে প্রার্থী পান তিনি সে এলাকার নাগরিকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করেন।

পরোক্ষ গণতন্ত্র বা জনমত কর্তৃক শাসন

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও নীতি লইয়া গঠিত একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সেই সকল দলের মধ্যে যে দল সর্বাপেক্ষা সুগঠিত, যে দল নিজের আদর্শ ও নীতি প্রচার ও ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ নাগরিকের মনকে প্রভাবিত করিয়া তুলিতে পারে এবং যে দলের প্রার্থী বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হন, সেই দলই সাধারণতঃ শাসন-কার্য পরিচালনের দায়িত্ব পায়। তাই আধুনিক গণতন্ত্রের যথার্থ সংজ্ঞা—রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের দ্বারা জনগণের শাসন বা Party Government।

Party Government

তবে সমস্ত নাগরিকই প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করিলেও যে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহারা এক হিসাবে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইবার পর তাঁহারা যদি নাগরিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে নাগরিকেরা তাঁহাদের পুনর্নির্বাচিত না করিয়া তাঁহাদিগকে উচিত শিক্ষা দিতে পারে। সেইজন্য পুনর্নির্বাচনের আশায় প্রতিনিধিরা

গণতন্ত্রে নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণ

নাগরিকদের স্বার্থহানিকর কোন কাজ করিতে পারেন না। নাগরিকেরা এইভাবে সরকারের মতামত, নীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

এ ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আরও তিনরকম ব্যবস্থা আছে যাহা দ্বারা নাগরিকেরা রাষ্ট্র-শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে ও প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলির নাম **গণভোট (Referendum)**, **গণোদ্যোগ (Initiative)** ও **পদচ্যুতি (Recall)**।

গণভোট

গণভোট অর্থে প্রস্তাবিত কোন আইনকে দেশের সমস্ত নাগরিকদের অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করার জন্য নাগরিকদের দাবী জানাইবার শাসনতান্ত্রিক বিধান বুঝায়। প্রস্তাবিত কোন আইন এইভাবে উপস্থাপিত হইবার পর অধিকাংশ নাগরিক দ্বারা অনুমোদিত হইলে তবেই আইন রূপে স্বীকৃত হয়। রাষ্ট্রের সমস্ত আইন সমগ্র নাগরিকদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করার বাধ্যতামূলক বিধানও সংবিধানে থাকিতে পারে।

গণোদ্যোগ

গণোদ্যোগ বলিতে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে নাগরিকদের নিজেদের উদ্যোগী হইবার অধিকার বুঝায়। এ ব্যবস্থায় জনকয়েক ভোটদাতা আবেদন করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে দিয়া কোন আইন বিধিবদ্ধ করাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকেরা আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে পারে। ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ঐ খসড়া আবার নাগরিক সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয়।

পদচ্যুতি

নির্বাচিত হইবার পর কোন প্রতিনিধি যদি দেশের বা নির্বাচকমণ্ডলীর অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করেন তবে নির্বাচকগণ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করার দাবী জানাইতে পারে। এই দাবী জানাইবার আইনসংগত অধিকারকে বলে পদচ্যুতি দাবীর অধিকার। নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক দাবী জানাইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচনের জন্য দাঁড়াইতে হয়।

বাস্তবে অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। প্রতিনিধিরা তাঁহাদের দলের নেতার খেয়ালখুসী মতেই চলিয়া থাকেন। তবে, সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট দেশে, যেখানে অধিবাসীরা সংখ্যায় সামান্য কিন্তু নাগরিক চেতনায় সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ, কেবল সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের এই ব্যবস্থাগুলি বর্তমানে কার্যকর।

গণতন্ত্রের দোষ-গুণ (Merits and demerits of Democracy) :

গুণ

(১) গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত। কারণ, কেবল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়ই বহুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের ফলে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনকল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব এবং প্রকৃত সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি আদর্শ উপলব্ধিও সম্ভবপর।

সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত এবং সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব

(২) গণতন্ত্র সর্বজনের শিক্ষা ও উন্নতির কারণ ও বাহন হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে এবং জনগণ উপলব্ধি করে যে তাহাদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং তাহারা তাহাদের মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয় ও তাহাদের মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। রাজনৈতিক চেতনার ফলে তাহারা সুনাগরিক হয় ও তাহাদের দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়।

নাগরিক সাধারণের মানসিক উন্নতি

(৩) গণতন্ত্রে শাসিত ও শাসক অভিন্ন বলিয়া সর্বাধিক পরিমাণে মংগলসাধন সম্ভব। বহু মনীষীর মতে, গণতন্ত্রের ন্যায় সমাজ ও সকল শ্রেণীর কল্যাণসাধনের উপযোগী আর কোন শাসনব্যবস্থা নাই।

নাগরিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মংগলপ্রদ

(৪) গণতন্ত্রে বিপ্লবের আশংকা সর্বাপেক্ষা কম থাকে। গণতন্ত্রে অভ্যস্ত জনসাধারণ বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন না করিয়া আইনসংগত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্রতী হয়।

বিপ্লবের আশংকা কম থাকে

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits of Democracy) : গণতন্ত্রের প্রতিকূল সমালোচনাও বহু লোকে বহু কাল ধরিয়া করিতেছেন। তাঁহাদের মতে, গণতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ নিম্নোক্ত রূপ :

(১) গণতন্ত্র অযোগ্য সংখ্যাধিকের শাসন ; সুতরাং, গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য এ-ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। লেকীর (Lecky) মতে, "গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, অজ্ঞতম ও অকর্মণ্যের শাসন, যেহেতু এ-সমস্ত শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক।"

গুণ অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ

রক্ষণশীলতা

(২) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রক্ষণশীল হইয়া থাকে। কারণ, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য শাসক সম্প্রদায় প্রগতিবাদী না হইয়া রক্ষণশীল হয়।

কর্মকুশলতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব

(৩) সকলে সমান, সকলে সকল কাজের যোগ্য—এই নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনায় বিশিষ্ট যোগ্যতা অত্যাবশ্যক। জনসাধারণ নির্বিচারে শাসনকার্যে নিযুক্ত হইলে শাসনব্যবস্থার কর্মকুশলতার অভাব দেখা দিবে। আবার সকলে স্বাধীন, সকলে সমান—এ নীতিতে বিশ্বাস করার ফলে কেহ আর কাহাকেও মান্য করিবে না, ফলে শাসনব্যবস্থায় নিয়মানুবর্তিতা থাকিবে না।

জনসাধারণের স্বার্থের উপর দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য

(৪) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আধুনিক গণতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে দলতন্ত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে শাসনক্ষমতা থাকে এবং শাসক-দল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের স্বার্থের উপরে দলীয় স্বার্থকে স্থান দেয়।

(৫) গণতন্ত্রে পুঁজিবাদ প্রশ্রয় পায়, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও আছে।

আপৎকালে অকর্মণ্য

(৬) গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র কোন সংকটজনক মুহূর্তে যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সহিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বা কার্যানুষ্ঠান করিতে পারে না বলিয়া সংকট মুহূর্তে অকর্মণ্য প্রমাণিত হয়।

উপসংহার : অধিকাংশ অভিযোগই কাল্পনিক ও অযৌক্তিক

তবে এ সমস্ত অভিযোগ সত্ত্বেও গণতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই কাল্পনিক ও অযৌক্তিক। জনসাধারণের অধিকাংশই যে অজ্ঞ, একথা সত্য নহে। যে-কোন নির্বাচকমণ্ডলীতেই কিছু সংখ্যক অজ্ঞ বা উদাসীন নির্বাচক থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীতেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকও থাকে এবং তাহাদের প্রভাবে সঠিক জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে ও উঠে। কর্মকুশলতার অভাবের অভিযোগও ঐতিহাসিক সত্য নয়। বহু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কর্মকুশলতা এক বা কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কর্মকুশলতা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বহুস্বার্থবিশিষ্ট বহু

শ্রেণীর নাগরিক দ্বারা গঠিত আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই সকল প্রকার স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তাবলী (Conditions for the success of Democracy): বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য তিনটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। (১) কোন দেশে গণতন্ত্র সফল করিয়া তুলিতে হইলে সে দেশের জনসাধারণকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহশীল হইতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। (২) জনসাধারণকে তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করার জন্য সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহাদের গণতন্ত্র কোন রকমে আক্রান্ত বা বিপদাপন্ন হইলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। উদাসীন বা ভীত জনসাধারণ গণতন্ত্র রক্ষা করিতে পারে না। (৩) প্রত্যেক নাগরিককে নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে হইবে। বিচার-বিবেচনা ও সততার সংগে ভোট দিয়া যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে হইবে এবং সমষ্টির স্বার্থরক্ষায় সর্বদা যত্নবান হইতে হইবে।

মিল-এর মতে প্রয়োজনীয় তিন সর্ত

অর্থনৈতিক অসাম্য থাকিলে গণতন্ত্র সফল বা স্থায়ী হইতে পারে না, কালক্রমে গণতন্ত্র ধনিকতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে অর্থনৈতিক অসাম্য যথাসম্ভব দূর করা অত্যাবশ্যক। গণতন্ত্রে এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যে ব্যবস্থায় সমস্ত কর্মেচ্ছু সক্ষম নাগরিক কাজ ও উপযুক্ত মজুরী পাইতে পারে। নিরন্ন বেকার জনগণের কাছে গণতন্ত্র অর্থহীন।

অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণ

কোন গণতন্ত্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। তাই, প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা অত্যাবশ্যক।

শিক্ষাবিস্তার

গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Democracy): আধুনিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক সরকার **এককেন্দ্রিক (Unitary)** হইতে পারে, আবার **যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)**-ও হইতে পারে।

এককেন্দ্রিক গণতন্ত্র অর্থে এমন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বুঝায় যাহাতে একটি মাত্র কেন্দ্র হইতেই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়—রাষ্ট্রশাসনের সমস্ত

ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থাকে। শাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রকে হয়ত বিভিন্ন প্রদেশে বা অংশে বিভক্ত করিতে পারে এবং কিছু ক্ষমতা এই সমস্ত প্রদেশ বা অংশের স্থানীয় সরকারের (**Local Government**) হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে। সে অবস্থায়ও স্থানীয় সরকার সর্বতোভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক।

একেকেন্দ্রিক গণতন্ত্র

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সুবিধা এই যে সমগ্র দেশে একই প্রকার শাসন ও আইন প্রচলিত থাকে এবং আপৎকালে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রাধীন ভূখণ্ড অতিবৃহৎ না হইলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয়। কিন্তু কোন বিশাল দেশে নানা জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি ও স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিয়া এক সংহত শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় না। এজাতীয় সরকারের পক্ষে সব জায়গায় সব বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সুবিধা-অসুবিধা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই এককেন্দ্রীভূত হয় না। রাষ্ট্র কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে এবং এক একটি অংশকে বলা হয় এক একটি **প্রদেশ** বা **রাজ্য (State)**। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশে বা রাজ্যে একটি প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার থাকে এবং প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার ছাড়াও একটি **কেন্দ্রীয় সরকার** (**Central Government**) থাকে। প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হয় না। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত, সুস্পষ্ট এবং সহজে পরিবর্তনীয় নয় এমন এক সংবিধান (**Constitution**) অনুসারে। সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা পৃথক পৃথক ভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে—স্বীয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উভয় প্রকার রাষ্ট্রই যথাসম্ভব স্বাধীনতা (autonomy) ভোগ করে। যে সমস্ত বিষয় সমগ্র দেশের স্বার্থের সংগে জড়িত এবং যে সমস্ত কার্য পরিচালনার জন্য ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন, সে সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। যেমন, বাহিরের রাষ্ট্রসমূহের সংগে সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধি, দেশরক্ষা, চলাচল, ডাক-তার-বেতার এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধায়ক নানা ব্যবস্থা। প্রাদেশিক সরকারের হাতে কেবলমাত্র প্রদেশ বা রাজ্যের স্বার্থ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে। যদি

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

প্রাদেশিক বা রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

কখনও রাজ্যে রাজ্যে বা কোন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন সে বিরোধের মীমাংসা করে **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court)**। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের দুই শ্রেণীর আইন মানিতে হয়—কেন্দ্রীয় আইন ও প্রাদেশিক আইন। [উপরের আলোচনা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই অনুধাবন করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য—(১) দুই সরকার (২) দুই আইন, (৩) দুষ্পরিবর্তনীয় লিখিত সংবিধান, (৪) দুই সরকারের সংবিধান অনুসারে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিধি এবং (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।]

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকারভেদ (Different forms of Federal Government)ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই প্রকার দেখা যায়। এক প্রকার যুক্তরাষ্ট্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন বিষয়সমূহ সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা (Residual powers) প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারে (যেমন, কানাডার যুক্তরাষ্ট্রে) প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাদ দিয়া বাকী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

দুই প্রকার যুক্তরাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার যুক্তরাষ্ট্র ঃ

কানাডায় প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতির বিরোধী। দুর্বল কেন্দ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক নীতির দ্বারা সমর্থিত।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার ন্যায় প্রদেশ বা রাজ্য অপেক্ষা কেন্দ্র অধিক শক্তিশালী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits and demerits of Federal Government) :

গুণ—বিশাল বিশাল দেশসমূহে, যেখানে এককেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের পক্ষে দেশের সমস্ত অংশে, সমস্ত বিষয়ে দক্ষ সুশাসন প্রচলিত বা পরিচালিত করা সম্ভব নয়, এবং যে সমস্ত দেশে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টিগত বহু বৈষম্য ও বিভেদ আছে (যেমন ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, রাশিয়া), সে সমস্ত দেশে নানা বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া ও জাতীয় ঐক্য অব্যাহত রাখিয়া শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনই প্রচলিত করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দোষ-গুণ ঃ

ক্ষমতা বিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের কর্মদক্ষতা বাড়ে। দুই সরকার দুই প্রকার আইন প্রণয়ন দ্বারা সমগ্র দেশের ও বিশেষ অঞ্চলের প্রয়োজন ও সমস্যা সহজে মিটাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বহু লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় এবং তাহার ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ, তাহাদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ বাড়ে।

দোষ—তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যস্থা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা হইতে জটিল ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসনক্ষমতা বিভাগের ফলে উভয় সরকারেরই দায়িত্ব কমে এবং এই ক্ষমতাবিভাগের ফলে উভয় সরকারই দুর্বল হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এ দুর্বলতা অধিক প্রকাশ পায়। কেন্দ্রের সহিত মতভেদের ফলে কোন কোন প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে পারে এবং তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হইতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আধুনিক মানুষের বিশ্বাস ক্রমবর্ধমান এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের দোষমুক্ত এক আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে এক বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা আধুনিক মানুষের আছে।

বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা

মন্ত্রিপরিষদশাসিত গণতন্ত্র (Cabinet form of Democratic Government): এইরূপ শাসনব্যবস্থায় একজন নামেমাত্র কর্তা—রাজা বা রাণী বা রাষ্ট্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রের নিয়মতন্ত্র অনুসারে তাঁহাকে চলিতে হয় এবং স্বেচ্ছায় শাসনব্যাপারে তিনি কিছু করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Ruler)। প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকে জনসাধারণের হাতে। দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট বা বিধানসভায় জনসাধারণ যে সকল প্রতিনিধি পাঠায় সেই সমস্ত প্রতিনিধি মারফত। বিধানসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় নিয়মতান্ত্রিক শাসক সেই দলের অধিপতিকে প্রধান মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার উপর অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচনের ভার থাকে। তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত তাঁহার দলীয় সভ্যগণ হইতে অন্যান্য মন্ত্রী বাছিয়া নেন। সাধারণতঃ তাঁহার মনোনীত সভ্যগণকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নির্বিচারে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই মন্ত্রীদের সকলকে লইয়া অথবা গুরুত্বপূর্ণ শাসনবিভাগসমূহের ভারপ্রাপ্ত

নিয়মতান্ত্রিক শাসক

প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচন

মন্ত্রীদের লইয়া **মন্ত্রিপরিষদ** (**Cabinet**) গঠিত হয়। রাষ্ট্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব থাকে এই মন্ত্রিপরিষদের উপর। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকে। যতদিন মন্ত্রিপরিষদ বিধানসভার আস্থাভাজন থাকে ততদিন মন্ত্রীরা শাসনকার্য চালান, বিধানসভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করেন।

ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের শাসনতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উজ্জল উদাহরণ।

দোষ-গুণ (Merits and Demerits) : এ শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে থাকে এবং মন্ত্রীরা বিধানসভার সভ্য। ততদিনই তাঁহারা ক্ষমতাসীন থাকেন যতদিন তাঁহারা বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন। সুতরাং বিধানসভাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারেন না এবং তাঁহাদের মাধ্যমে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগে সহযোগিতা স্থাপিত হয় এবং এই সহযোগিতা জনকল্যাণের কারণ হয়।

মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতন্ত্রের দোষ-গুণ

কিন্তু জরুরী কোন অবস্থায় এ ব্যবস্থা তেমন কর্মকুশল হইতে পারে না। কোন সমস্যার সমাধান ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রীর বিভিন্ন মত থাকিতে পারে এবং সে সকল লইয়া দীর্ঘ আলোচনায় অযথা সময় নষ্ট হইতে পারে ও হয়। এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় সরকারের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। কারণ, এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে। বিভিন্ন সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। তাছাড়া, বিধানসভার অনাস্থাভাজন হইবার ফলে মন্ত্রিসভার পতন যখন তখনই হইতে পারে। এইভাবে ঘন ঘন বিভিন্নমতাবলম্বী বিভিন্ন দলের হাতে শাসনক্ষমতা গেলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এরূপ পরিবর্তন দেশের মংগলের দিক হইতে সর্বদা বাঞ্ছনীয় নাও হইতে পারে। ফরাসিদেশে ও পাকিস্তানে কিছুদিন পূর্বে প্রায়ই এক মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া আর এক মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিতেছিল। ফলে শাসনব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিতে থাকে। স্থির ভাবে কোন উন্নতিবিধায়ক পরিকল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা, বিশেষতঃ অনগ্রসর পাকিস্তানের পক্ষে, সম্ভব

জরুরী অবস্থায় অকার্যকর

শাসন-নীতিতে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা

শাসনব্যবস্থায় বিপর্যয়

হইতেছিল না। দেশের লোক অশান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছিল। এই অনিশ্চিত অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য এই দুই দেশে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সামরিক একনায়কতন্ত্রের সূচনা দেখা দিয়াছে।

রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Presidential form of Democratic Government)ঃ এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতেই রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা থাকে। জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির অধীন কর্মচারী রূপেই রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন। শাসন-কার্য সম্বন্ধে তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে কেবল পরামর্শ ই দিতে পারেন; সে পরামর্শ গ্রাহ্য করা বা না করা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। এরূপ শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থাবিভাগ বা বিধানসভার কাছে শাসন-বিভাগের বা রাষ্ট্রপতির কোন দায়িত্ব থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্রশাসনে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত কর্তা

বিধানসভার নিকট রাষ্ট্রপতি দায়ী নহেন

রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্রের দোষ-গুণ (Merits and demerits of the Presidential form of Democratic Government)ঃ

এ শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে এরূপ ব্যবস্থায় জাতীয় সংকটের সময় দ্রুত কোন কর্মনীতি অনুসরণ করা যায়। রাষ্ট্রপতি সমস্ত শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হওয়াতে তিনিই কর্মনীতি স্থির করিতে পারেন। আইনসভার বাগ্বিতণ্ডায় কর্মনীতি নির্ধারণে সময় নষ্ট করিতে হয় না।

সঙ্কটকালে কার্যকারিতা

এ শাসনব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যায় না। সুতরাং, সেই নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন আশংকা থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগের সভ্য বা ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়ীও নন। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটিতে পারে এবং এই সংঘর্ষের ফলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

শাসননীতিতে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে

শাসননীতির ত্রুটি

এ শাসনব্যবস্থা আলোচনা প্রসংগে একটি কথা লক্ষণীয় যে, কোন রাষ্ট্রের কর্তাকে রাষ্ট্রপতি (President) বলিয়া অভিহিত করিলেই সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হইবে, এমন নহে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু এ দেশের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্র নয়, মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতন্ত্র।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): একনায়কতন্ত্রের একজন নায়কই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা থাকেন। তিনি প্রজারঞ্জক রাজা বা সর্বজনমান্য নায়ক হইতে পারেন, আবার স্বেচ্ছাচারী জবরদস্ত পীড়ক বা শাসকও হইতে পারেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালি, জার্মানি ও স্পেনে একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইটালির মুসোলিনি, জার্মানির হিটলের, স্পেনের জেনারেল ফ্রাংকো প্রভৃতি চরম একনায়কত্বের মূর্ত প্রতীক। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনক্ষমতা এক দল বা ব্যক্তির হস্তে সমগ্রভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া এরূপ রাষ্ট্রকে **সামগ্রিক রাষ্ট্র**-ও (Totalitarian State) বলা হইয়া থাকে।

সর্বময় কর্তা একজন নায়ক

প্রত্যেক একনায়কেরই নিজস্ব একটি দল থাকে। সে দলের বিরোধী কোন দলকে একনায়ক সহ্য করে না। রাষ্ট্রনায়ক যে ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহার বিরোধিতা করিতে গেলে মৃত্যু বা কারাদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। বিরোধী দলকে (বিরোধী দল গণতন্ত্রে অত্যাবশ্যক হইলেও) রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি ও প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির ব্যক্তি হিসাবে কোন স্বীকৃতি নাই। রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যেটুকু প্রয়োজন ব্যক্তিকে সেটুকু স্থানই দেওয়া হয়। গণতন্ত্রে বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকে, একনায়কতন্ত্রে সেরূপ কোনও মানমর্যাদার সে অধিকারী হয় না।

বিরোধী দলের অস্তিত্ব সহ্য করা হয় না

ব্যক্তির ব্যক্তি হিসাবে মানমর্যাদা থাকে না

একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে নায়ক যদি সত্যই রাষ্ট্রের হিতৈষী হন (যেমন, তুরস্কের ভূতপূর্ব একনায়ক কামাল পাশা), তাহা হইলে তাঁহার পরিচালিত রাষ্ট্র, কোন প্রকার মতবিরোধ না থাকায়, অতি দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। নানাপ্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দেশ সহজেই এবং অতি দ্রুত উন্নত হয়। আর তিনি স্বার্থপর হইলে রাষ্ট্রের অগ্রগতির কোন আশাই থাকে না এবং তাঁহার একান্ত অনুগত না হইতে পারিলে নাগরিকদের

নায়ক রাষ্ট্রের হিতৈষী হইলে রাষ্ট্রের প্রগতি দ্রুত হয়, নচেৎ রাষ্ট্রের অবস্থা শোচনীয় হয়

অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র-ক্ষমতার উত্তরাধিকার এক সমস্যা এবং সে কারণে ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। এ সকল কারণে একনায়কতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য

গণতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তাহাকে পূর্ণতম সুযোগ দান করে। নিয়মিত নির্বাচনব্যবস্থার দ্বারা রক্তপাত ও হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে দেশ উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের জন্ম ও দায়িত্ব দুই-ই নির্ভর করে দলাদলি, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাদ প্রভৃতির উপর। সম্প্রতি ফ্রান্স, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে সংকীর্ণ দলাদলি ও নেতাদের ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

ভারত গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে

ঐ দেশগুলিতে গণতন্ত্রের অবস্থিতির জন্য যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকার দরকার, তাহা না থাকায় সে দেশগুলি একনায়কত্বের পদানত হইয়াছে। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে একনায়কত্ব শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক পথ বাছিয়া লইয়া দেশের বিরাট জনসমষ্টিকে প্রেম, অহিংসা ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ এক সুসংবদ্ধ নাগরিকমণ্ডলীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতের সাফল্য গণতন্ত্রেরই সাফল্য সূচিত করিবে।

প্রশ্নাবলী

১। অ্যারিস্টটলের মতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।

(Show how Aristotle classified Governments.)

২। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ তুলনা কর।

(Compare the advantages and disadvantages of a Unitary Government with those of a Federal Government.)

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী?

(What are the characteristics of a Federal Government ?)

৪। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় কর ও গণতন্ত্রের দোষ-গুণ আলোচনা কর।

(Define Democracy and discuss its merits and demerits.)

৫। গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্ত কী কী?

(What are the conditions of the success of a Democracy ?)

৬। মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী? ইহার দোষগুণ আলোচনা কর।

(What are the features of the Cabinet form of Government? Discuss its merits and demerits.)

৭। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার সহিত মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত শাসনব্যবস্থার তুলনা কর।

৮। একনায়কতন্ত্রী শাসনের বৈশিষ্ট্য কী কী? উহার দোষগুণ আলোচনা কর।

॥ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা বিভাজন ॥

(Organs of Government and Separation of Powers)

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : সরকারের কাজ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন এবং আইনভংগকারীকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা (অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা)। এই তিন বিভাগকে যথাক্রমে **আইন বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Executive)** এবং **বিচার বিভাগ (Judiciary)** বলা হয়।

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

ক্ষমতা বিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) : শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) সরকারী কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : নীতিনির্ধারণমূলক (**deliberative**), শাসনমূলক (**magisterial**) ও বিচারমূলক (**judicial**)। তবে তাঁহার মতে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা অভিন্ন হইতে পারে। মধ্যযুগে ক্ষমতা বিভাগের নীতি লুপ্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে এক মতবাদ প্রসার লাভ করে, যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ—বিশেষতঃ শাসন ও বিচার বিভাগ—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (**Montesquieu**) ইহাকে একটি সম্পূর্ণ মতবাদে পরিণত করেন এবং বিখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ ব্ল্যাকস্টোন (**Blackstone**) এ-মতবাদ সমর্থন করেন।

বিভিন্ন যুগে ক্ষমতা বিভাজনের নীতি

মন্টেস্কুর মতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুস্পষ্ট ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে এবং তিনটি বিভাগ পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক বিভাগ অন্য বিভাগের অন্যায় প্রতিরোধ করিবে এবং তাহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হইবে। প্রাচীন কালে রাজা একাধারে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তিনি খেয়ালখুশীমত আইন করিতে পারিতেন, যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনিয়া তাহার বিচার করিতেন। এরকম শাসন স্বেচ্ছাচারীর উৎপীড়ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মন্টেস্কু বিভিন্ন বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সমর্থক

সংজ্ঞা

সুতরাং, যে নীতি অনুসারে সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কাজ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইবে, এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না—এ নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহাই **ক্ষমতাবিভাগের নীতি** (**The Theory of Separation of Powers**)।

ক্ষমতা বিভাগ কাম্যও নহে সম্ভবও নহে

সমালোচনাঃ নীতিগতভাবে ক্ষমতা বিভাগের সমর্থনের পক্ষে যুক্তি থাকিলেও কার্যতঃ ইহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে, সম্ভবও নহে। সকল শাসনব্যবস্থায়ই এক বিভাগ অন্য বিভাগের কিছু না কিছু কাজ করে, এক বিভাগ অপর বিভাগকে সামান্য হইলেও নিয়ন্ত্রিত করে এবং একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত যুক্ত থাকে।

তিন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দিবে।

সকল সরকারেই শাসন বিভাগের হাতে যেমন জরুরী অবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে। তেমনি আবার বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করে। আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার শাসন বিভাগ আইনসভা ভাঙিয়া দিতে পারে, এই ভয় দেখাইয়া আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। কার্যতঃ সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা না থাকিলে শাসনকার্যে অচল অবস্থা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক বিভাগকে স্বতন্ত্র ও সমান ক্ষমতার অধিকারী করিলে, বিভাগে-বিভাগে বিরোধ উপস্থিত হইলে মীমাংসার উপায় থাকিবে না। বর্তমানে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই আইন বিভাগকে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়।

গণতন্ত্রে এ নীতির গুরুত্ব অস্বীকৃত

স্বৈরাচারী শাসকদের উচ্ছেদ করিয়া জনগণের কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাবিভাজন নীতির উদ্ভব হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে জনগণের কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পর এ নীতির গুরুত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য এ নীতি অত্যাবশ্যকও নয়। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাবিভাজন স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই আছে। ব্রাইস (Bryce)-এর মতে, স্বাধীনতা রক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত থাকিলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায় (Eternal vigilance is the price of Liberty.)।

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বাঞ্ছনীয়

তবে এ নীতির আংশিক যথার্থতা অনস্বীকার্য। সমস্ত ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। আজকাল ক্ষমতাবিভাজন নীতির

আংশিক প্রয়োগই প্রচলিত। সকলেই এটুকু স্বীকার করে যে, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন হওয়া উচিত। নচেৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

ক্ষমতাবিভাজন নীতির প্রয়োগ: ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাবিভাজন নীতি স্বীকৃত হয় নাই। সেখানে শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী এবং মন্ত্রীরা আইনসভার সভ্য। হাউস্ অব্ লর্ডস্ আইন সভার অংশ কিন্তু ইহা আবার ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয়।

ইংল্যাণ্ডে অস্বীকৃত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত। সেখানে সরকারের তিন শ্রেণীর কাজ মোটামুটি-স্বাধীন তিনটি বিভাগের উপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, তবে আইনসভার সভ্য নন। আবার সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসাবে তিনি বিচারকদের নিযুক্ত করেন ও আইনসভার (কংগ্রেস) সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ভিন্ন কোন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি ও উচ্চ শাসকপদে নিয়োগ তাঁহার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা সিনেটের (কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ) অনুমোদন সাপেক্ষ এবং সিনেট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং সেখানেও ক্ষমতাবিভাজন সুস্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয়।

আমেরিকায় স্বীকৃত

তবে আমেরিকাতেও ক্ষমতাবিভাজন সুস্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয়

ব্রিটিশ শাসনকালে **ভারতবর্ষে** এ নীতির স্বীকৃতি মোটেই ছিল না। কারণ, তখন ভারতের সমস্ত শাসনক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও এ নীতিকে মানিয়া লওয়া হয় নাই (পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় এ নীতি সর্বত্রই প্রায় অস্বীকৃত)। মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য চালায়: মন্ত্রীরা আইনসভার সভ্য এবং মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব ও অস্তিত্ব আইনসভার সমর্থনের উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ শাসক রাষ্ট্রপতি, তাঁহার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা আছে এবং তিনি উচ্চ বিচারালয়-সমূহের বিচারক নিয়োগ করেন। তবে এতদিন জেলাশাসক (District Magistrate) যে সব বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, বর্তমানে তিনি আর তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষে অস্বীকৃত

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ: আইন বিভাগ: আইন

বিভাগের প্রথম ও প্রধান কাজ দেশের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করা। ইহা পুরাতন কোন আইন বাতিল বা সংস্কারও করিতে পারে। ইহার অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করা ও মঞ্জুর করা। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করাও আইন বিভাগের এক বিশেষ অধিকার ও কাজ। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আইনসভা গ্রহণ করিলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আইন বিভাগের কাজ : (১) আইনপ্রণয়ন (২) আয়ব্যয় মঞ্জুরকরণ (৩) শাসন নিয়ন্ত্রণ

আইন বিভাগের বিচারক্ষমতাও থাকে। আইনসভা উচ্চ রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে এবং সে অভিযোগের বিচার করিতে পারে। ভারতীয় লোকসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে ও তাঁহার বিচার করিতে পারে। আইনসভা যথাবিধি গৃহীত প্রস্তাবানুসারে বিচারকদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে।

(৪) বিচার

আইন বিভাগের গঠন : আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে **দুইটি পরিষদ বা সভাবিশিষ্ট আইনবিভাগই** (**Bi-cameral Legislatu e**) বেশী প্রচলিত। দুইটি পরিষদ বা সভার মধ্যে একটি নিম্নপরিষদ বা সাধারণ সভা এবং অপরটি উচ্চপরিষদ বা দ্বিতীয় সভা নামে অভিহিত হয়।

নিম্নপরিষদ বা সাধারণ সভা জনসাধারণ বা সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। ক্ষমতার দিক দিয়া এ পরিষদের ক্ষমতা দ্বিতীয় সভা বা উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে। আইন বিভাগের পূর্বোক্ত কাজসমূহ (সরকারী আয় ব্যয় মঞ্জুর করা, মন্ত্রিপরিষদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করা) নিম্নপরিষদ বা সাধারণ সভাই করিয়া থাকে। কোন কর ধার্য করার অধিকারও এ পরিষদ বা সভার থাকে।

নিম্নপরিষদ বা সাধারণ সভা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এবং অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী

উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। কিন্তু ইহার মেয়াদ নিম্নপরিষদের মেয়াদ অপেক্ষা দীর্ঘতর। এ পরিষদের সভ্যেরা কোথাও জন্মসূত্রে, কোথাও সরকারের মনোনয়নে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন মারফত সভ্যপদ লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের উচ্চপরিষদ, হাউস অফ লর্ডস, লর্ড উপাধিধারী অভিজাত শ্রেণী দ্বারা গঠিত। কোন লর্ড-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লর্ড-সভার সভ্য হন। কানাডায় উচ্চ-পরিষদের সভ্যেরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। ভারতবর্ষে উচ্চপরিষদের

উচ্চপরিষদ মনোনয়ন বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতার অধিকারী

অধিকাংশ সভ্যেরা নির্বাচিত, অবশ্য এখানে কয়েকজন মনোনীত সভ্যও আছেন।

দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন বিভাগের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Bi-cameral Ligislature) :

ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কম

গুণ : আধুনিক সরকারসমূহের কাজ বহুপ্রকার এবং ইহাদের বহু আইন প্রণয়ন করিতে হয়। একটি মাত্র পরিষদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকিলে, অতিব্যস্ততার ফলে কখনও কখনও আইনে ভুল-ত্রুটি হইতে পারে। সেইজন্য দুইটি পরিষদেই আইনের খসড়া আলোচিত হইলে ভুল-ত্রুটির আশংকা অনেক কমিয়া যায়। উচ্চপরিষদের কর্মব্যস্ততা কম, তাই সেখানে প্রস্তাবিত আইনের বা কোন খসড়ার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়।

এক পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভার দোষ

জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটিমাত্র পরিষদে জন-সাধারণের কোন ক্ষণিক উত্তেজনার চাপে বাধ্য হইয়া প্রতিনিধিরা এমন কোন আইন পাশ করিতে পারেন যাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণবাহী নাও হইতে পারে। জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভরশীল নয় এমন দ্বিতীয় পরিষদ এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নপরিষদের তথা জনসাধারণের হঠকারিতা রোধ করিতে পারে।

দ্বিপরিষদবিশিষ্ট আইন-সভায় বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ নানা শ্রেণী ও স্বার্থের জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। নিম্ন-পরিষদ জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলে উচ্চপরিষদ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইতে পারে এবং এইভাবে সমস্ত শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যায়। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন অঞ্চল (States) লইয়া গঠিত। সে সমস্ত রাষ্ট্রে দুইটি পরিষদ থাকে। উচ্চপরিষদে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সমান সংখ্যক আসন দেওয়া যায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপরিষদ সিনেটে প্রত্যেক রাজ্যের দুইজন করিয়া সভ্য আছে)। নিম্নপরিষদে অঞ্চলগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা অনুযায়ী সভ্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

দোষ: উচ্চ বা দ্বিতীয় পরিষদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। ইংরেজ রাজনীতিবিদ ল্যাস্কির (Laski) মতে, কার্যতঃ উচ্চপরিষদ নিম্নপরিষদকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা রাখে না, বরং উচ্চপরিষদের কায়েমী স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিরা প্রগতির পথে বাধা দেয়। উচ্চপরিষদ সৃষ্টি ব্যয়সাধ্য এবং ইহা আইন প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি করে ও বিলম্ব ঘটায়। তাই, উচ্চপরিষদ নিম্নপরিষদকে সমর্থন করিলে উহা অতিরিক্ত, অবান্তর এবং নিম্নপরিষদের বিরোধিতা করিলে উহা ক্ষতিকর। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রসমূহ উচ্চপরিষদের ক্ষমতা বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিলেও এই পরিষদগুলিকে অবলুপ্ত করিতে ইচ্ছুক নয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রে এবং কোন কোন রাজ্যের আইনসভায় দ্বিতীয় পরিষদ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিষদ ব্যয়সাধ্য, জটিলতার স্রষ্টা, অতিরিক্ত, অবান্তর, ক্ষতিকর

আধুনিক গণতন্ত্রসমূহে দ্বিতীয় পরিষদ স্বীকৃত

শাসন বিভাগের কাজ: শাসন বিভাগের প্রধান কাজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা এবং দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা। এই কারণে দেশের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং দেশে আইনের প্রয়োগ ও আইনভংগকারীকে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা এ বিভাগ করিয়া থাকে। কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা এ বিভাগের কাজ। সুতরাং এ বিভাগ পররাষ্ট্রে দূত প্রেরণ করে ও পররাষ্ট্রসমূহের দূত গ্রহণ করে। পররাষ্ট্রসমূহের সংগে চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি এই বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ বিভাগের হাতে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া শাসন বিভাগ বিচারকদের নিয়োগ করে, অপরাধীদের দণ্ড মকুফ করে বা হ্রাস করে।

বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা

শাসন বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ সমবেতভাবে শাসন পরিচালনা করে। এই বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে—স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-বাণিজ্য, বিচার প্রভৃতি।

শাসন বিভাগের গঠন: শাসন বিভাগের গঠন এক এক দেশে এক এক রকম। মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতন্ত্রে মন্ত্রিপরিষদই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী। কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজা বা রাণী (যেমন ইংল্যাণ্ডে) অথবা রাষ্ট্রপতি (যেমন ভারতবর্ষে) থাকিলেও তাঁহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না।

শাসন বিভাগের গঠনের বিভিন্নতা

রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্রে নির্দিষ্টকালের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদ থাকিলেও উহা রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা মাত্র। মন্ত্রিপরিষদ বা রাষ্ট্রপতির অধীন অসংখ্য সরকারী কর্মচারী (বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণ বিভিন্নভাবে নিযুক্ত হয়) দৈনন্দিন শাসনকার্য চালায়। ইহারা আমলাতন্ত্র (Civil Service) নামে খ্যাত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে ইহাদের নিযুক্ত করা হয়। মন্ত্রিসভার দলীয় নীতির পরিবর্তন হইলেও ইহারা সমস্ত দলের নীতিকেই দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া সমান নিষ্ঠার সহিত কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রপতি প্রধান কর্তা

আমলাতন্ত্র

বিচার বিভাগের কাজ: দুই বিরোধী পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনিয়া আইন অনুযায়ী কোন মামলার বিচার করাই বিচার বিভাগের কাজ। আইন প্রয়োগ করিতে গিয়া এ বিভাগ অনেক সময় আইনের ব্যাখ্যা করে এবং বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা হইতে নূতন আইনের (judge-made laws) উদ্ভব হয়। নির্দিষ্ট কোন আইনের আওতায় পড়ে না এমন মামলা বিচারকেরা প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন বা ন্যায়নীতি অনুসারে মীমাংসা করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকদের রায় হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার সংবিধানের কোন বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া বে-আইনী কিছু করে কিনা তাহা দেখাও বিচার বিভাগের কাজ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে শাসনক্ষমতার বণ্টন (distribution of powers লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে অথবা দুই আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সর্বোচ্চ বিচারালয় (Supreme Court) তাহার মীমাংসা করে। আধুনিক লিখিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্র) নাগরিকদের যে সকল মৌলিক অধিকার (fundamentil rights) দেওয়া হয়, সেগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব বিচারালয়ের।

আইন অনুযায়ী বিচার ও ব্যাখ্যাসূত্রে নূতন আইন প্রণয়ন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের সংরক্ষক বিচারালয়

বিচার বিভাগের গঠন: দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকগণকে লইয়া বিচার বিভাগ গঠিত হয়। শাসন বিভাগ (ভারতে রাষ্ট্রপতি, ইংল্যাণ্ডে রাজা বা

রাণী) সাধারণতঃ বিচারক মনোনীত করেন। আমেরিকার কোন কোন আদালতে নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে ভোটদাতাগণ বিচারকদের যোগ্যতা অনেক সময় বুঝিতে পারেন না। উপরন্তু পুনরায় নির্বাচিত হইবার জন্য বিচারকগণ কখনই জনমতকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহেন না। এই কারণে, নির্বাচনের দ্বারা বিচারক নিয়োগ প্রথা আজকাল সকলেই অপছন্দ করেন। মণ্টেস্ক্যুর ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসরণ করিয়া প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশেই বিচারালয়ের মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য বিশেষভাবে অযোগ্য বা অক্ষম প্রমাণিত না হইলে শাসন বিভাগ বা আইনসভা (অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা) বিচারকদের পদচ্যুত করিতে পারেন না।

বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকগণকে লইয়া বিচার বিভাগ গঠিত

প্রশ্নাবলী

১। ক্ষমতাবিভাজন নীতি বলিতে কী বোঝ? ক্ষমতা বিভাজন নীতি আলোচনা কর।

(What do you mean by the theory of Separation of Powers? Give a critical estimate of the theory.)

২। 'সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিভাজন সম্ভব নহে এবং উহা কাম্যও নহে'—এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

(The strict Separation of Powers is not only impracticable as a working Principle of Government but it is not also to be desired in practice. —Explain.)

৩। সরকারের প্রধান প্রধান বিভাগ কী কী? প্রত্যেক বিভাগের কাজ বর্ণনা কর।

(What are the principal organs of Government and describe their respective functions.)

৪। গণতান্ত্রিক সরকারের আইন বিভাগের কর্যাবলী বর্ণনা কর।

(Describe the functions of the Legislature of a Democratic Government.)

৫। দুই পরিষদ বা সভাবিশিষ্ট আইন বিভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

(State the arguments for and against a Bi-cameral Legislature.)

॥ জাতীয় জনসমাজ, জাতি, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ॥

(Nationality, Nation, Right of Self-determination)

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) : এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার-আচরণে ও অধিকার-অভিযোগে ঐক্য থাকিলে সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের লইয়া এক জনসমাজ (**People**) গঠিত হয়। উপরোক্ত ঐক্যবন্ধনসমূহই বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টিকে জনসমাজে পরিণত করে। বংশগত ঐক্যও জনসমাজ গঠনে সহায়তা করিতে পারে।

ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, আচার-আচরণ ও অধিকার-অভিযোগে ঐক্য জনসমাজ গঠনের উপাদান

কোন জনসমাজে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে ঐ জনসমাজ **জাতীয় জনসমাজে (Nationality)** পরিণত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ফলে জাতীয় জনসমাজ একই সরকারের অধীনে সংহতি কামনা করে ও নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজই জাতীয় জনসমাজ

'Nationality' শব্দটি 'জাতীয়তা' বা 'জাতীয় ঐক্যবোধ' বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। **'Nationalism'**-এর অর্থ 'জাতীয়তাবাদ' বা 'জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ'।

জাতি (Nation) : বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, বা মুক্ত হইতে সচেষ্ট, রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সুসংগঠিত জনসমাজই **জাতি (Nation)**। রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা সংগঠনের ইচ্ছাই জাতি ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে পার্থক্যের মূল। জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা চরম পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায়। ইহুদীরা নিজেদের ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনারও যথেষ্ট উন্মেষ হইয়াছিল। কিন্তু ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই ইহুদীরা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সুসংগঠিত জনসমাজই জাতি

জাতিগঠনের উপাদান (Elements of Nationality) :

(১) **কুলগত ঐক্য (Racial Unity) :** কাহারো কাহারো মতে

কুলগত ঐক্য জাতি গঠনে প্রয়োজন। কিন্তু কুলগত ঐক্য জাতি গঠনে সহায়তা করিতে পারিলেও ইহা অপরিহার্য নয়। বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে আজ আর পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অবিমিশ্র জাতি নাই। তাহা ছাড়া, বাস্তব ক্ষেত্রে কুলগত ঐক্য ছাড়াই সুসংহত জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এ প্রসংগে ইংল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য ; আবার ইংরেজ ও জার্মানদের কুলগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা দুই পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

কুলগত ঐক্য :

(২) **ভাষাগত ঐক্য (Unity of Language):** ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনে সহায়ক হইলেও (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজী ভাষার প্রভাব) অপরিহার্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জনসমষ্টি বাস করে—জার্মান, ইটালিয়ান ও ফরাসি।

ভাষাগত ঐক্য

(৩) **ধর্মগত ঐক্য (Religious Unity):** মধ্যযুগীয় ধারণায় জাতি-গঠনে ধর্মগত ঐক্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমানে ধর্মগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় না। আধুনিক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদী, ও খ্রীষ্টান জনসংখ্যা লইয়া গঠিত হইয়াও জাতীয় সংহতি ও শক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। এই প্রসংগে ভারতীয় প্রজা'ন্ত্রের দৃষ্টান্তও স্মরণীয়।

ধর্মগত ঐক্য

(৪) **ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity):** এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করার ফলে কোন জনসংখ্যা সহজে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারিলেও (যেমন ভারতে) ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনে অপরিহার্য নয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস না করিয়াও ইহুদীরা একজাতিতে পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে, ভারতের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে একজাতিতে পরিণত করে নাই।

ভৌগোলিক ঐক্য

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনের বাহ্যিক উপাদান মাত্র। ইহাদের অভাবেও জাতিগঠন সম্ভব।

(৫) **ভাবগত ঐক্য (Spiritual Unity):** জাতিগঠনের অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদান হইল ভাবগত ঐক্য এবং এ ঐক্যের ভিত্তি জনসাধারণের মানসিক সমানুভূতি। এক জনসংখ্যা একই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে অগ্রসর

হইতে থাকে এবং কালক্রমে একই ঐতিহ্যের অধিকারী হয়। সে জনসংখ্যা একই দুঃখ-সুখ ও প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞার অংশভাগী হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হয় এবং একই সামাজিক ও রাজনৈতিক অভীষ্ট লাভের জন্য সুসংহত হয়। সম দুঃখ-সুখ, প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা ও স্বার্থের ভিত্তিতে যে ভাবগত ঐক্য জন্মায় তাহাই নানা বাহ্যিক বিভেদ ভুলাইয়া এক জনসমষ্টিকে এক জাতিতে পরিণত করে।

ভাবগত ঐক্য

জাতিগঠনের অপরিহার্য উপাদান এই ভাবগত ঐক্য দুই বিপরীত মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত—একদিকে ইহা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে, অপরদিকে ইহা ভিন্নভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য জনসমাজ হইতে জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে। ইতিসাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে স্বাজাত্যবোধ এবং ফরাসিদের ও স্পেনীয়দের প্রতি বিদ্বেষ এই দুই ভাবের দ্বারাই ইংরেজদের জাতীয়ত্ব পরিপুষ্ট।

জাতিগঠনের উপাদান

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination): ইতালীয় দার্শনিক মাৎসিনি (*Mazzini*)-র মতে প্রত্যেক জাতির কোন না কোন বিষয়ে নিজস্ব প্রতিভা থাকে। সেই প্রতিভা বিকাশের জন্য ও নিজেদের সভ্যতা এবং কৃষ্টির দ্বারা মানব সভ্যতার উন্নতিসাধনের জন্য রাষ্ট্রসমূহ "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (One Nation, one State) এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইংল্যাণ্ডে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল-ও জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের সমর্থক ছিলেন।

মাৎসিনির মত

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন জাতীয় ভিত্তিতে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব করেন এবং কার্যতঃ 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতি সমর্থন করেন। **প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকারই আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের মৌলিক নীতি।** অনেক জাতিই পরাধীনতার ফলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি তাহাদের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারে বিশেষ সহায়তা করে এবং এ নীতি এক সাধারণ নীতি বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই নীতি স্বীকার না করিলে অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুপ্তহত্যা, বিবাদ ও অশান্তি লাগিয়াই থাকিবে। প্রধানতঃ এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মুসলমান নেত

উড্রো উইলসনের মত

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি

জিন্না ভারতে পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী করেন এবং এই দাবী শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে স্বীকৃত হয়।

সমালোচনা: কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠন সকল অবস্থায় শুভকর কিনা তাহা বিবেচ্য। কতকগুলি ক্ষুদ্র জাতি লইয়া গঠিত কোন সুসংহত রাষ্ট্র জাতীয় ভিত্তিতে বহুধা বিভক্ত হইলে বিভিন্ন জাতির স্বার্থহানির আশংকা থাকে। কোন একজাতির দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য না থাকিলে, জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদিগকে একরাষ্ট্রাধীন করিলে সে ব্যবস্থা কার্যকরী বা সুফলবাহী হয় কিনা তাহা সন্দেহজনক।

বিভিন্ন জাতির স্বার্থহানির আশংকা

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রসংগঠন আরম্ভ হইলে ইহার শেষ কোথায় হইবে তাহা অনুমান করা যায় না। কোন রাষ্ট্রাধীন এক অসন্তুষ্ট সম্প্রদায় বিভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া পৃথক রাষ্ট্রগঠন দাবী করিতে পারে। এরূপ ঘটিতে থাকিলে কোন বিরাট দেশের বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া বিদেশী শত্রু সহজেই আক্রমণ চালাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হইয়া নিজেদের যথেষ্ট উন্নতিসাধন সম্ভব হয় না। এ রাষ্ট্রগুলি সর্বদা পরস্পরের সংগে বিবাদে লিপ্ত থাকিবে—শান্তির পরিবর্তে অশান্তি আসিবে। শেষ পর্যন্ত দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবেশী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইবে।

বিদেশী শত্রুর আক্রমণ সম্ভব

বাস্তব ঘটনা এ নীতির বিপক্ষে। বহুজাতিগঠিত রাষ্ট্রসমূহ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র) কোন এক-জাতি-গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা কম অগ্রসর বা কম শক্তিশালী নয়।

অবাস্তব

কোন প্রাচীন সংস্কৃতিবান জাতি পরপদানত হইলে বা কোন সবিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংগত কারণে স্বাধিকার দাবী করিলে এ নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। এ দাবী নৈতিক দাবী মাত্র, আইনগত দাবী নয়।

নৈতিক দাবী

এই নীতি যে অশান্তি ও অসন্তোষ আনয়ন করিতে পারে, ভারত ও পাকিস্তানই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইবার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও অর্থনৈতিক কলহ তুমুল হইয়া

এ নীতির কুফল

ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজও এ সমস্যাগুলির কোন স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয় নাই।

বহুজাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্বক্ষেত্রে স্বীকার্য না হইলেও, নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের থাকা উচিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য স্বীকৃত অধিকার

জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার অধিকার, নিজস্ব ভাষা রক্ষার অধিকার, স্থানীয় আচার ও রীতি রক্ষার অধিকার এবং আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার।

প্রশ্নাবলী

১। জাতি কাহাকে বলে? জাতিগঠনের উপাদান কি কি?

(What is a Nation? What are the elements of Nationality?)

২। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কী বোঝ? আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

(What is meant by the right of self-determination? Is it applicab[le] in all cases?)

॥ নাগরিকত্ব ॥

(Citizenship)

নাগরিক (Citizen) : 'নাগরিক' কথাটির সাধারণ অর্থ নগরের বাসিন্দা। তবে পৌরবিদ্যায় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ ব্যুৎপত্তির উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগর (এবং তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম) লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত। এই সকল রাষ্ট্রকে বলা হইত নগর-রাষ্ট্র (City-State)। কোন নগর-রাষ্ট্রের যে সকল পুরুষ অধিবাসী রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত, মাত্র তাহাদিগকেই সে সময় নাগরিক বলা হইত—স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসেরা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না।

নাগরিক শব্দের প্রাচীন সংজ্ঞা

আজকাল নগর-রাষ্ট্র আর নাই। তবে সেই প্রাচীন কাল হইতেই কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কথা বুঝাইতে সাধারণ ভাবে নাগরিক কথাটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে—**কোন রাষ্ট্রের যে সকল অধিবাসী সেই রাষ্ট্রেরই অনুগত এবং যাহাদের** সেই রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে সম্পত্তি ভোগ-দখল করার, পারিবারিক জীবন যাপন করার, লেখাপড়া করার ও এই প্রকার **নানা সামাজিক অধিকার আছে,** এবং **সেই রাষ্ট্রের শাসনকার্য-পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে সেই সকল অধিবাসীই সেই রাষ্ট্রের নাগরিক।** নাগরিকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দুই রকম অধিকারই থাকে।

আধুনিক সংজ্ঞা

যাহারা রাষ্ট্রের অনুগত অথচ রাষ্ট্রনির্দিষ্ট বিশেষ যোগ্যতা না থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদের বলা হয় **প্রজা** (**Subjects**)। দেউলিয়া, পাগল কিংবা কোন গুরু দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কোন রাষ্ট্রেই থাকে না। তবে তাহারা, যে রাষ্ট্রের অনুগত অধিবাসী সেই রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে তাহাদিগকে গণ্য করা হয়।

প্রজা

বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিক আর প্রজা ছাড়া আর এক শ্রেণীর অধিবাসী বাস করে। তাহাদের বলা হয় **বিদেশী** (**Aliens**)। ভ্রমণ, সরকারী কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন কার্যোপলক্ষে যখন কোন এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য কোন রাষ্ট্রে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য

বিদেশী

জন্য বসবাস করে, তখন সেই অন্য রাষ্ট্রে সে বিদেশী রূপে গণ্য হইবে, সে-রাষ্ট্রের নাগরিক বা প্রজা হিসাবে নহে। ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্য কোন কাজ উপলক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুগত যে সকল নাগরিক আছে তাহারা ভারতবর্ষে বিদেশী। তবে ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি - wealth of Nations-এর সভ্য-দেশসমূহের অধিবাসীদের ভারতবর্ষে ঠিক বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হয় না। বিদেশীরা কেবল সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

নাগরিকত্ব লাভের উপায় (Mo es of acq iring Cit z nshi) নাগরিকত্ব দুই উপায়ে লাভ করা যায়—জন্মসূত্রে ও স্বেচ্ছায়।

জন্মসূত্রে দুই রকম উপায়ে নাগরিকত্ব লাভ হয়—রক্তের অধিকারে (j s sanguinis) ও জন্মস্থান অনুসারে (jus soli)। প্রথমতঃ পিতামাতা যে দেশের নাগরিক, সন্তানও সে দেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা হইল রক্তের অধিকার (jus sanguinis)। আবার ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইন অনুসারে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে যে জন্মগ্রহণ করে সে ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। তাহার পিতামাতা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও এ নিয়মে তাহার ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের কোন বিঘ্ন হয় না। যেমন, কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে সে সন্তানকে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

জন্মসূত্র

এই দুই নিয়ম একই সংগে প্রযুক্ত হইলে শিশু জন্মের সংগে সংগেই দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া পড়িবে। যেমন, ভারতের কোন নাগরিকের সন্তান ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে, সেই ভারতীয় শিশু একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার অধিকারী হয়—ইংল্যাণ্ডে জন্ম বলিয়া ইংল্যাণ্ডের আবার পিতামাতা ভারতীয় বলিয়া ভারতের। ইহাতে ভবিষ্যতে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক সে থাকিবে তাহা তাহাকে বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়, অথবা যে রাষ্ট্রে সে দীর্ঘতর সময় জড়িত থাকে, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া ধরা হয়।

স্বেচ্ছাসূত্র

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর নাগরিকই **স্বাভাবিক নাগরিক (N tural Citizns)**।

বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে কোন রাষ্ট্র একজন বিদেশীকে নাগরিক অধিকার দেয়। এই শ্রেণীর নাগরিক হইল **গৃহীত** বা **আইনবলে অনুমোদিত নাগরিক (Naturalized Citizens)।**

স্বাভাবিক ও গৃহীত নাগরিক

কোন রাষ্ট্রের বিদেশী অধিবাসী যদি সে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইতে চায়, তবে প্রথমে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হয়। তাহার আগে তাহাকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করিতে হয়। প্রধান শর্ত, রাষ্ট্রের অধীনে দীর্ঘকাল বসবাস (সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর)। নাগরিকত্বের জন্য আবেদনে তাহাকে জানাইতে হইবে যে সে সেই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হইয়া ঐ রাষ্ট্রেই চিরকাল বসবাস করিবে।

দীর্ঘ বসবাসের শর্ত

ইহা ছাড়া, অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করা, সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া, সরকারী চাকুরী নেওয়া ইত্যাদি কয়েকটি কারণেও এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত বা অনুমোদিত হইতে পারে।

অন্যান্য কারণ

গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিককে সেই দেশের ভাষা জানিতে হয়।

কোন কোন রাষ্ট্রে সে সাধারণ সব অধিকারই পায়, কোন কোন রাষ্ট্রে পায় আংশিক ভাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন গৃহীত নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারে না।

গৃহীত নাগরিকের অধিকার

নাগরিকত্ব লোপ (Loss of Citizenship) : বিবাহের ফলে নাগরিকত্ব লোপ পায়। কোন স্ত্রীলোক অপর রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে সে তাহার স্বামীর দেশের নাগরিক হয়। যে নাগরিক তাহার রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করিতে করিতে দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, বা নিজের রাষ্ট্র হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিয়া নাগরিক হিসাবে তাহার কার্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরী লইয়া নিজের রাষ্ট্রকে তাহার কর্মদক্ষতা হইতে বঞ্চিত করে, সে রকম নাগরিককে কোন কোন রাষ্ট্র নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করে।

লোপের কারণ :
(১) বিবাহ
(২) সৈন্যবাহিনী হইতে পলায়ন
(৩) দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি
(৪) ভিন্ন রাষ্ট্রে চাকুরী

নাগরিকের অধিকার (Rights of a Citizen) : ইংরেজ লেখক লাস্কির (Laski) মতে, নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্র তাহাকে যে সকল

সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, তাহাই হইল নাগরিকের প্রকৃত অধিকার। ইহাদের মধ্যে যে অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে লিখিত ও বিচারলয় কর্তৃক সংরক্ষিত, সেগুলিকে বলা হয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)।

অধিকার দুই প্রকার : নাগরিকের অধিকারগুলি দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—সামাজিক অধিকার (Civil Rights) ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights)। প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের স্বীকৃতিই নাগরিককে বিদেশী হইতে পৃথক করে। সমাজজীবনকে নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে ভোগ করার, জীবনকে সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তোলার অধিকারই হইল নাগরিকের সামাজিক অধিকার।

বিভিন্ন প্রকার সামজিক অধিকার

নাগরিকের সামাজিক অধিকারের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হইল **বাঁচার অধিকার**। রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনকে সর্বভাবে বিপন্মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

বাঁচার অধিকারের মত নাগরিকের অপর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল **স্বাধীন ভাবে চলাচল করার ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার**। তবে যুদ্ধ প্রভৃতি সংকটজনক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে।

বিবাহাদি করিয়া **পরিবার গঠন করিবার অধিকার** নাগরিকের অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য এ অধিকারও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ-দখল করার অধিকার অনেক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য অথবা নাগরিকদের অধিকাংশের কল্যাণের জন্য আধুনিক অনেক রাষ্ট্রের নাগরিকের এ অধিকার সংকুচিত করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে। নাগরিকদের অন্যান্য মৌলিক সামাজিক অধিকার হইতেছে **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, সভা-সমিতি গঠনের অধিকার, ভাষার ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, আইনানুসারে সমাজে সুবিধা পাইবার অধিকার, লেখাপড়া শেখার ও বেকার না থাকার অধিকার**।

ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিকদের উপরিউক্ত সমস্ত মৌলিক অধিকারই (Fundamental Rights) মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

সামাজিক অধিকার ছাড়া নাগরিকের কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারও থাকে। সেগুলি হইতেছে **রাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অধিকার, প্রবাসে বিপদগ্রস্ত হইলে সাহায্য পাইবার অধিকার, সরকারী চাকরীর অধিকার,** অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি জানাইবার জন্য শাসন-বিভাগের কাছে **আবেদন করার অধিকার ও নির্বাচনের** (নির্বাচনে ভোট দিবার ও নির্বাচিত প্রার্থী হইবার) অধিকার। অধিকারের বলেই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকেরা রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার।

বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen) : সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব, উন্নতি ও আদর্শ উপলব্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি মনে প্রাণে অনুগত থাকিয়া আপদে বিপদে রাষ্ট্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, রাষ্ট্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলা, নিয়মিত কর (Taxes) দেওয়া, রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট কাজ যত্ন ও আন্তরিকতার সংগে সম্পন্ন করা, রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য সততার সংগে ভোট দিয়া উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন প্রভৃতি দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রত্যেক নাগরিকেরই রহিয়াছে।

(১) আনুগত্য
(২) বিপৎ কালে সাহায্য
(৩) আইন মানা
(৪) নিয়মিত কর দেওয়া
(৫) সৎভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ

সুনাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a good Citizen) : নাগরিকের দায়িত্ব পালন করিতে প্রত্যেক নাগরিকেরই বিশেষ কতকগুলি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সুনাগরিকের উপযুক্ত শিক্ষা ও যথেষ্ট বিবেকবুদ্ধি থাকা চাই। সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করিতে নিজের স্বার্থ বলি দিতে যে ভয় পায় না, দলের জন্য যে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না, রাষ্ট্রে কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হইলে তাহা বোঝার, বিশ্লেষণ ও সমাধান করার বুদ্ধি ও চেষ্টার অভাব যাহার হয় না, এমন নাগরিকই সুনাগরিক।

(১) শিক্ষা
(২) বিচারবুদ্ধি
(৩) স্বার্থত্যাগ
(৪) রাষ্ট্রসেবা

সুনাগরিকতার পথে বাধা (Hindrances to good Citizenship): বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে **উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরতা ও দলাদলির মনোভাব** সুনাগরিক হইবার পথে বিঘ্ন ঘটায়।

কোন নাগরিক উদ্যমহীন হইলে সর্বসাধারণের স্বার্থের প্রতি উৎসাহহীন হয়, দশের সংগে সহযোগিতায় কোন জনহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, সে নির্বাচনে ভোট দেয় না বা পদপ্রার্থী হয় না এবং যুদ্ধাদির প্রয়োজনে অস্ত্রধারণে ইচ্ছুক বা সাহসী হয় না। উদ্যমহীন নাগরিকের চিন্তায় ও কার্যে আলস্যের ফলে শাসকদের ঔদাসীন্য দেখা দেয় ও রাষ্ট্রে সুশাসন থাকে না।

উদ্যমহীনতা

আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যার বিশালতা ও প্রশাসনিক জটিলতার জন্য নাগরিকগণ ক্রমশঃ উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছে।

আধুনিক গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। দলীয় প্রতিযোগিতায় দলসমূহ দেশের স্বার্থ ভুলিয়া দলের স্বার্থের প্রতি অধিক মনোযোগী হয় এবং উহার ফলে দেশের ক্ষতি হয়।

স্বার্থপরতা

উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরতা ও দলাদলির মনোভাব ছাড়াও, সুনাগরিক হইবার পথে অপর বাধা হইল শিক্ষার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা নাগরিক বুঝিতে পারে না। সুতরাং, সমস্যার সঠিক সমাধান সে খুঁজিয়া পায় না ও সমস্যা সমাধানে ভালভাবে সাহায্য করিতে পারে না।

শিক্ষার অভাব

প্রশ্নাবলী

১। নাগরিক কাহাকে বলে? স্বাভাবিক নাগরিক ও গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিকের পার্থক্য কী?

(What is a Citizen? Distinguish between a Natural and a Naturalised Citizen.)

২। নাগরিকত্ব অর্জন ও লোপের উপায় ও কারণ কী কী?

(Describe the modes of acquisition and loss of Citizenship.)

৩। আধুনিক নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকার ও কর্তব্য বর্ণনা কর।

(What are the Principal rights and duties of a modern Citizen?)

৪। সুনাগরিকের গুণাবলী ও সুনাগরিক হইবার বাধাসমূহ আলোচনা কর।

(Discuss the qualities of a good Citizen and the hindrances to good Citizenship.)

॥ অধিকার ও কর্তব্য ॥

(Rights and Duties)

যে সমাজবোধ হইতে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে সে সমাজবোধই অধিকার ও কর্তব্যের উৎস। রাষ্ট্রাধীন নাগরিক যেসকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং রাষ্ট্র যে সকল সুযোগ-সুবিধা তাহাকে দেয়, উহাই তাহার অধিকার। কিন্তু কাহারো অধিকারই অবাধ ও অসীম হইতে পারে না। সামাজিক মানুষের প্রত্যেকটি অধিকার সীমাবদ্ধ এবং অপর ব্যক্তির অধিকার দ্বারা সে-সীমা চিহ্নিত।

অধিকারের অসীমতা

কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হওয়া মাত্র অপর সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব হইল সে অধিকারে কোনভাবে হস্তক্ষেপ না করা। সুতরাং, একের অধিকারের সংগে অপরের কর্তব্য অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং ব্যক্তির সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কোন অধিকার ভোগ তাহার সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির অধিকারভোগ অপর সকলের কর্তব্য পালনের উপর এবং অপর সকলের অধিকারভোগ ব্যক্তির কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে।

একের অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়

রাষ্ট্র এই প্রত্যাশায় প্রত্যেক নাগরিককে বিভিন্ন অধিকার দান করে, যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করিয়া অধিকারসমূহ ভোগ করিতে এবং আত্মবিকাশ সাধন করিয়া সাধারণের হিতার্থে সচেষ্ট হইতে পারে। রাষ্ট্র প্রত্যেকের অধিকার রক্ষা করে এবং একজনকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা সংরক্ষণের অধিকার দাবী করি এবং সে অধিকারে সংগে রাষ্ট্রানুগত্য, করদান প্রভৃতি কর্তব্যগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিবার ও নাগরিকের কর্তব্য

প্রশ্নাবলী

'অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত' অথবা, 'অধিকার থাকিলে কর্তব্য থাকিবে'—ব্যাখ্যা কর।

Explain: Rights and duties are correlative or rights imply duties .)

॥ আইন ও স্বাধীনতা ॥

(Law and Liberty)

আইন (Law) : মানুষ যত সংগঠন, সংঘ, সমিতি প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির জন্যই বিধি-বিধান প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক সংগঠনের সভ্যেরা সেই সকল বিধি-বিধান স্বেচ্ছায় মানিয়া চলে। রাষ্ট্র মানুষের সবচেয়ে বড় সংগঠন। রাষ্ট্রাধীন জনসংখ্যার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্য নানা বিধিনিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নাগরিকদের সে সকল বিধি-নিষেধ মানিতে হয়।

অস্টিনের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র স্বীয় কর্মের পরিধি নির্ধারণের জন্য ও সকল নাগরিকের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করে, সে সকল নিয়মকে বলে আইন। আইন-অমান্যকারীকে সরকার শাস্তি দেয়। তাই, অস্টিনের (Austin) মতে, **আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আদেশ** (command of the sovereign)।

উড্রো উইলসনের সংজ্ঞা

পৃথিবীর সব দেশেই দীর্ঘ প্রচলিত রীতিনীতি (Customs) হইতে ও ধর্ম হইতে বহু আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকল আইনের উৎস অনুসরণ করিতে গেলেই বোঝা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আদেশ নয়। তাহা হইলেও দীর্ঘপ্রচলিত সামাজিক বা ধর্মীয় রাজনীতিসমূহ সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও প্রযুক্ত হইবার পরই আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের মতে, মানবসমাজের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও চিন্তার যে অংশ রাষ্ট্র কর্তৃক বিধানে পরিণত ও সুস্পষ্টভাবে সমর্থিত হইয়াছে তাহাই আইন। ("Law is that portion of the established habit and thought of mankind which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the Government.")

হল্যাণ্ডের সংজ্ঞা

অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে, মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মই আইন (a general rule of external action enforced by a sovereign political authority)।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে (ক) আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে ; (খ) কোন সাধারণ নিয়ম আইনের মর্যাদা লাভ করিতে

হইলে ঐ নিয়ম রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে (রাষ্ট্র না থাকিলে আইন থাকে না); (গ) উহা বাধ্যতামূলক—আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্রের বিধান অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অন্যান্য সংগঠনের নিয়ম মানা বা না মানা সভ্যের ইচ্ছাধীন।

আইনের বৈশিষ্ট্য

আইন ও নীতিজ্ঞান (Law and Morality): আইন কেবল মানুষের বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, নাগরিকের মানসিক চিন্তার সংগে উহার কোন সম্পর্ক নাই। আইন ভংগের কথা চিন্তা করিলে উহার জন্য কোন শাস্তির বিধান নাই; কেবল কার্যত আইন ভংগ করিলেই শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নীতিজ্ঞান বাহিরের আচরণ ও মানসিক চিন্তা দুই-ই নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং নীতি আইনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বহুক্ষেত্রে নীতিশাস্ত্রের সূত্র আইন প্রণয়নের মূলে থাকে এবং দেশের আইন দেশের নৈতিক অগ্রগতির পরিচায়ক হয়। কারণ, নীতি ও আইন উভয়ই মানুষের অন্তর ও বাহিরের যুগপৎ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে নীতিবিরুদ্ধ আচরণ আইনেও নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু নীতিগর্হিত কাজ মাত্রই বে-আইনী নয় এবং অনেক কাজ নীতিবিরুদ্ধ না হইয়াও বে-আইনী (যেমন অমাদের দেশে রাস্তার ডান দিক ধরিয়া গাড়ী চালান)। আইন রাষ্ট্র দ্বারা সর্বক্ষেত্রে সমর্থিত, কিন্তু নীতির পিছনে সে সমর্থন সর্বক্ষেত্রে থাকে না এবং নৈতিক নিয়মভংগের জন্য রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে শাস্তি বিধানও করে না।

আইন মানুষের বাহ্য আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে ও নীতি মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহির সম্পর্কযুক্ত

আইন রাষ্ট্র সমর্থিত, নীতি সর্বত্র রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত নয়

আইনের উৎস (Sources of Law):

আইন সভা: আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে আইন সভাই (Legislature) আইনের প্রধানতম উৎস। প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইন সভার অনুমোদন দ্বারা জনমতকে আইনে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে জনমতই আইনের প্রধান উৎস।

আইনের উৎস:
(১) জনমত ও বিধান সভা (২) দীর্ঘপ্রচলিত রীতিনীতি (৩) ধর্ম
(৪) পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা
(৫) আইনের ব্যাখ্যা
(৬) ন্যায়বোধ

দীর্ঘপ্রচলিত রীতিনীতি: প্রত্যেক দেশেই দীর্ঘপ্রচলিত রীতিনীতি (Customs) হইতে বহু আইনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। হিন্দু-আইন প্রধানতঃ নানা রকম রীতিনীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

ধর্ম : বহু ধর্মীয় নিয়ম আইন হিসাবে গৃহীত হইয়াছে ; যেমন, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন রচিত।

পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা : পণ্ডিতগণ সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মতামত প্রদান করেন, তাহা হইতেও নূতন আইন জন্মলাভ করে। হিন্দু আইনে মনু-পরাশরের ব্যাখ্যা, মুসলমান-আইনে হাদিজের নির্দেশ আইন হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক কালে ইংল্যাণ্ডে কোক, ব্ল্যাকস্টোন প্রভৃতি আইনজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুক্ষেত্রেই আইনের সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

বিচারের রায় : সঠিক কোন আইনের আওতায় পড়ে না এমন মামলার বিচার করিতে গিয়া বিচারক যে রায় দেন বা প্রচলিত কোন আইনের যে ব্যাখ্যা করেন তাহা পরবর্তী কালে আইন হিসাবে গৃহীত হয়। এইভাবে বিচারের রায় (Judicial Precedents) আইন সৃষ্টি করে।

ন্যায়বোধ : ন্যায়বোধও (Equity) আইনের অন্যতম উৎস। অনেকক্ষেত্রে কোন আইনের নির্দেশ অনুসারে কোন বিরোধ মীমাংসা সম্ভব না হইলে, বিচারক ন্যায়বোধ, উপস্থিতবুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বিরোধের মীমাংসা করেন এবং তাঁহার মত বা রায় নূতন আইন সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা (Liberty) : শব্দার্থ অনুসারে 'স্বাধীনতা'র অর্থ কাহারও নির্দেশাধীন না হইয়া ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারা। কিন্তু সামাজিক জীবনে ঐ অর্থে স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতার নামান্তর। কোন সমাজেই কোনকালে এরূপ স্বাধীনতা ছিল না বা থাকিতে পারে না। ঐভাবে স্বাধীন হইলে যে কোন বলবান্ ব্যক্তি দুর্বলের সর্বস্ব কাড়িয়া নিতে পারে এবং বাস্তবিক প্রস্তাবে কেহই স্বাধীনতা বা ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারে না। ঐ অর্থে স্বাধীনতা ও আইন পরস্পরবিরোধী নয়। কারণ, আইন ব্যক্তির অসামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই রচিত হয়।

উচ্ছৃংখলতা ও প্রকৃত স্বাধীনতার পার্থক্য

প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার অর্থ আইন বা নিয়ন্ত্রণরহিত অবস্থা নয়। সকলের স্বাধীনতা ভোগের, সুযোগসৃষ্টির জন্য সকলের উপর প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের আরোপ অত্যাবশ্যক। স্বাধীনতা আবাধ বা অসীম হইতে পারে না। স্বাধীনতার অর্থ কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। ব্যক্তিত্বের

স্বাধীনতা ভোগের জন্যই বিধি নষেধ প্রয়োজনীয়

পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ অপসারণের নাম স্বাধীনতা। সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণের অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। সকলের মংগল ও স্বাধীনতা ভোগের জন্য সকলের উপর বিধিনিষেধ অত্যাবশ্যক।

ল্যাস্কির মত

ল্যাস্কির (Laski) মতে যে পরিবেশে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ সত্তা উপলব্ধির সুযোগ পায়, সে পরিবেশ রক্ষাই স্বাধীনতা এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য যে সকল বিধিনিষেধর অপসারণ অত্যাবশ্যক, তাহাদের অপসারণই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য নাগরিকের কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার থাকা এবং তাহাদের কতকগুলি কর্তব্য পালন অত্যাবশ্যক।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different forms of Liberty) ঃ

প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty ঃ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে মানুষ যে কাল্পনিক স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহাকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে কোন স্বাধীনতা থাকা অসম্ভব, শক্তিশালীর স্বেচ্ছাচারিতামাত্রই তখন থাকা সম্ভব।

ব্যক্তিস্বাধীনতা (Civil Liberty) : ব্যক্তিস্বাধীনতা বলিতে অন্যের অধিকার নষ্ট না করিয়া নিজের অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও ভোগ করার স্বাধীনতা বুঝায়। ইহাকে সামাজিক স্বাধীনতাও বলা যায়; কারণ, সুস্থ জীবনেই ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভব। ব্যক্তিস্বাধীনতায় ব্যক্তি যে অধিকার লাভ ও ভোগ করে সেগুলি হইল তাহার সামাজিক অধিকার।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) ঃ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণের (নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার) অধিকার বুঝায়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ এবং স্বোপার্জিত অর্থ সম্ভোগের স্বাধীনতা বুঝায়। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সমধিক, এ স্বাধীনতা না-থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) ঃ জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে কোন দেশ বা জাতীর পরাধীনতা হইতে মুক্তি বুঝায়। জাতীয় স্বাধীনতাই ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি।

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty) পূর্বে আইন ও আইন-প্রয়োগকর্তৃপক্ষের অবস্থিতিকে স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করা হইত। যাঁহারা এইরূপ ভাবিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে আদি প্রাকৃতিক অবস্থায়ই মানুষ প্রকৃতভাবে স্বাধীন ছিল। মানুষ তখন প্রকৃতির আইন মানিয়া সুখী ছিল, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারও ছিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে মানুষ তাহার স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার অলীক কল্পনামাত্র। স্বাধীনতা অবাধ ও অসীম হইলে এবং আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

আইন না থাকিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইত

দুর্বলের অধিকার ও স্বাধীনতা যাহাতে সবলের দ্বারা বিপন্ন না হয়, ব্যক্তির লোভ ও স্বার্থ যাহাতে সমষ্টির মংগলের ক্ষতি না করিতে পারে তাহার জন্যই আইন এবং আইন প্রয়োগ করা ও আইনভংগকারীর শাস্তিবিধানের জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকা অত্যাবশ্যক। আইন স্বেচ্ছাচার সংযত করে মাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতাকে কোন মতেই ব্যাহত করে না।

আইন স্বেচ্ছাচার সংযত করে

রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে বহু জনের সুখ ও হিতের জন্য অতি অল্প কয়েকজনকে আবশ্যক ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে বা দেয়। এই বাধা বহুর স্বাধীনতা রক্ষা করে, নির্বিঘ্ন করে, কিন্তু কোনমতেই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে না।

বহুজনের হিতের জন্যই আইন

আইন ব্যক্তির ন্যায়সংগত অধিকারের সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, একজনের অধিকারের সহিত অপরের অধিকারের, ব্যক্তির অধিকারের সহিত সমষ্টির অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করে। মূলতঃ, আইনের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির চরম বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। এ পরিবেশই প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীনতা। রাষ্ট্র নাগরিক-সাধারণকে অধিকার দান করে এবং আইনের সাহায্যে প্রদত্ত অধিকার রক্ষা করিয়া সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই, আইনই স্বাধীনতা সৃষ্টি করে। আইন থাকিলেই স্বাধীনতা থাকে, আইনের শাসন না থাকিলে স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীনতা আইনের দ্বারা পরিচালিত এবং আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল ("Law is the condition of Liberty.")।

আইন স্বাধীনতার স্রষ্টা

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty) : ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব

বিকাশের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য, সকলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা মূল্যবান সম্পদ বলিয়া মনে করে। তাই, প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাগরিকগণই চায় যে ব্যক্তিস্বাধীনতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা সরকার যেন ব্যক্তিস্বাধীনতায় অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ না করিতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার কতকগুলি বিধিসম্মত উপায় প্রত্যেক রাষ্ট্রব্যবস্থায় থাকে। ঐ উপায়সমূহই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। বলা বাহুল্য **আইনের ভিত্তিতেই এ রক্ষাকবচগুলি সক্রিয় হইয়া ওঠে।**

প্রত্যেক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এরূপ রক্ষাকবচ থাকে

একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই, স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান রক্ষাকবচ দেশে গণতান্ত্রিক শাসন—যে শাসনে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে। গণতন্ত্রেও শাসক সম্প্রদায়ের দুর্নীতিতে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ বা বিভিন্ন হইতে পারে। তাই, সংবিধানে নাগরিকের কতিপয় মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে। বিশেষ কোন জাতীয় সংকটের সময় ছাড়া গণতন্ত্রে নাগরিকের এ অধিকারগুলির উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না।

গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার

অনেকের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাগ অর্থাৎ ব্যবস্থা, শাসন ও বিচার এই তিন বিভাগের পৃথকীকরণ স্বাধীনতার অনুকূল। তবে পূর্ণ ক্ষমতা বিভাজন সম্ভব নহে। ইংলণ্ডে ক্ষমতা বিভাজন না ঘটিলেও ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

ক্ষমতা বিভাজন ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা

কিন্তু ক্ষমতা বিভাজন নীতির একটি মূল নির্দেশ হইল বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। সৎ ও স্বাধীন বিচারকমণ্ডলী কোন ভাবে ব্যবস্থা বা শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল না হইলে তাহাদের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ ও সম্ভব হয়।

আইনের শাসন (Rule of Law) কথার অর্থ এই যে দেশে আইনের চোখে সকলে (জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী, শাসকমণ্ডলী ও বিরোধী দল) সমান গণ্য হইয়া সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করিবে। আইনের শাসন স্বাধীনতা রক্ষা করে। ইংল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাজন নীতি স্বীকৃত হয় নাই ও সংবিধানে নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি শুধু আইনের শাসন আছে বলিয়াই দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা কোন

আইনের শাসন

ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় না। ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ব্যক্তি হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus) আবেদন দ্বারা আদালতের নিকট দোষমুক্তির দাবী করিতে পারে, আদালতও তাহাকে নির্দোষ মনে করিলে সসম্মানে ছাড়িয়া দিতে পারে। বহু আধুনিক গণতন্ত্র এই হেবিয়াস কর্পাস বিধিকে নিজেদের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকার করিয়াছে।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ও বিরোধী দল

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক। বিরোধী দলের সমালোচনার ফলে এবং ভয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত দেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এ ব্যবস্থায় সব সময় মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সেইজন্য মন্ত্রিগণ কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

স্বাধীনতা স্পৃহা

স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল নাগরিকদের স্বাধীনতাস্পৃহা। যে দেশের জনসাধারণ সর্বদা স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করে এবং উহা রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও জাগরূক, যে দেশে নাগরিকরা স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে অনিচ্ছুক এবং উপযুক্ত মূল্য দিয়া সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত, সে দেশেই স্বাধীনতা সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইনের উৎসসমূহ কী কী?

(Define Law. What are the sources of Law ?)

২। 'আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আদেশ'—এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

(Law is the command of the sovereign.—Explain)

৩। স্বাধীনতা বলিতে কী বুঝ? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কী কী?

(Explain what you mean by Liberty. What are the different forms of Liberty ?)

৪। আইন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সহিত স্বাধীনতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(Explain how Liberty is related to Law and Authority.)

৫। 'আইন না থাকিলে স্বাধীনতা থাকে না' অথবা 'স্বাধীনতা আইনের সৃষ্টি'—এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

(Law is the condition of Liberty. or Liberty is a creation of Law.—Elucidate)

॥ রাজনৈতিক দল ॥

(Political Parties)

আধুনিক প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র এখন কার্যতঃ দলতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে দলীয় শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জন-সাধারণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দল

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা এবং তাহাদের সমাধান লইয়া দেশে নানা মত ও নানা মতাবলম্বী লোক থাকে। এক নীতিতে বিশ্বাসী যথেষ্ট সংখ্যক লোক যখন একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয় তখন সেই জনসংখ্যাকে একটি **রাজনৈতিক** দল বলে। দলীয় স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন দল কেবল দলীয় স্বার্থসাধন করার জন্য সংঘবদ্ধ লইলে সে দল আদর্শহীন **কুচক্রী দলে** (**coterie, faction**) পরিণত হয়।

কুচক্রী দল

রাজনৈতিক দলের কার্য

এক আদর্শ এবং উহা সফল করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যতালিকা লইয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ঐ আদর্শে বিশ্বাসী ও নির্দিষ্ট কার্যতালিকার সমর্থকেরা দলের সভ্য হয়। দল উহার আদর্শ ও কার্যতালিকা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের সমর্থনলাভের চেষ্টা করে এবং জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের জন্য সর্বাধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইয়া শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসনভার লইবার জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং রাজনৈতিক দলের কাজ (১) আদর্শ স্থির করিয়া কার্যতালিকা প্রণয়ন, (২) কার্যতালিকা প্রচার, (৩) নির্বাচন পরিচালনা, (৪) মন্ত্রিসভা গঠন, (৫) মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না পারিলে বিরোধী দলরূপে থাকিয়া সরকারের দোষত্রুটির সমালোচনা করা।

রাজনৈতিক দলসমূহের শ্রেণীবিভাগ

মতের পার্থক্য অনুসারে রাজনৈতিক দলসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যে দল সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন চায়, সে দলকে উগ্রবামপন্থী (Extreme Left), যে দল প্রগতিমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী সে দলকে বামপন্থী (Left), যে দল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয় সে দলকে দক্ষিণপন্থী (Right) এবং যে দল আইনসভায় সংখ্যালঘু, সে দলকে **সরকার-বিরোধী দল** (**Opposition**) বলিয়া স্বীকৃত হয়। বিরোধী দল সরকারের প্রতিটি কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,

তাহারা সমালোচনা করে এবং জনসাধারণকে সরকারের দোষত্রুটি দেখাইয়া দেয়।

বিরোধী দল

বিরোধী দলের গুরুত্ব যথেষ্ট। এইদলের সমালোচনার ভয়ে শাসকমণ্ডলী সর্বদা সতর্ক থাকে এবং সেই ভয়ে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। বিরোধী দলের সমালোচনা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনা বাড়ায়।

রাজনৈতিক দলের দোষ ও গুণ (Merits and demerits of Party System) : রাজনৈতিক দল না থাকিলে গণতন্ত্র সম্ভব হয় না। আইনসভায় দলীয় সংগঠন না থাকিলে, যে কোন সভ্য স্বাধীনভাবে ভোট দিতে চাহিবে; তখন সরকারের সমস্ত শক্তি, উৎসাহ ও সময় অধিকাংশের সমর্থন লাভের চেষ্টায় ব্যয় হইবে এবং অধিকাংশের সমর্থন সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কোন সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি বা পথ অনুসরণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। অধিকাংশের সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাসই গণতান্ত্রিক সরকারের বল। অন্যথায় সরকার দুর্বল ও শাসনব্যবস্থা বিশৃংখল হইতে বাধ্য।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সুচিন্তিত মত উপস্থিত করে। ইহাতে জনসাধরণ সমস্যাসমূহের বিভিন্ন দিক আলোচনা ও বিচার করিয়া সমস্যাসমূহ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে ও উহাদের সমাধানের সুচিন্তিত পথ আবিষ্কার করিতে পারে।

জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা

বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা ও প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক নানা বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে।

জনসাধারণের রাজনৈতিক উৎসাহবৃদ্ধি

বিরোধী দল বিশেষভাবে গণতন্ত্রের সহায়ক হয়। বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে এবং শাসকমণ্ডলীর নীতি ও কার্যের দোষত্রুটি উদ্ঘাটনের ফলে শাসকমণ্ডলী স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে না এবং শাসনক্ষমতা হারাইবার ভয়ে জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। এজন্য স্বৈরাচারী শাসক বা ডিক্‌টেটররা বিরোধীদল বরদাস্ত করে না।

শাসক মণ্ডলীর স্বৈরাচার প্রতিরোধ :

পছন্দসই বিরোধী দল থাকিলে জনসাধারণ সহজেই পরবর্তী নির্বাচনে তাহাকে ভোট দিবে ও অবাঞ্ছনীয় সরকারের অবলুপ্তি ঘটিবে। ফলে, দলীয় প্রথা গণতন্ত্রকে হিংসাত্মক এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ হইতে রক্ষা করে।

হিংসাত্মক বিপ্লব ছাড়া শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব

দলীয় প্রথা ও শাসন অনেক সময় দলের সভ্যদের চোখে দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বড় করিয়া তোলে। নির্বাচনে জয়লাভই দলের কাছে সর্বাপেক্ষা বড় লক্ষ্য হইয়া উঠে এবং দলের স্বার্থবৃদ্ধির জন্য দেশ বা জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিতে দলের কোন কুণ্ঠা থাকে না।

দোষ : দলীয় মনোভাব

দলীয় প্রথায় দলের সভ্যদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এ কারণে অনেক যোগ্য, সৎ ও স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তি কোন দলে যোগ দিতে চাহেন না।

সভ্যদের স্বাতন্ত্র্য লোপ

দলীয় স্বার্থে দলীয় সরকার অনেক সময় অযোগ্য লোকদের নানা কাজে নিযুক্ত করে এবং ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। অনেক সময় অযোগ্য নিয়োগ ও অন্যায়কারীকে অন্ধভাবে সমর্থনের ফলে দলীয় শাসন দেশে দুর্নীতি বাড়ায়।

অযোগ্যের নিয়োগ

তবে, জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকিলে, কোন স্বার্থে বা লোভে অন্যায়কারীকে সমর্থন না করিলে এবং দলীয় নেতা সৎ, নিঃস্বার্থ ও যোগ্য হইলে দলীয় শাসনের ত্রুটিসমূহ দেশে দেখা দিতে পারে না।

দ্বিদল বনাম বহুদলব্যবস্থা (Two Party System vs Multi-party System) : দুইটি মাত্র রাজনৈতিক মত ও দল কোন দেশে থাকিলে জনসাধারণের পক্ষে মত ও দল নির্বাচনে খুব সুবিধা হয়। প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি মাত্র মত; সুতরাং, যে কোন একটি মত ও দল বাছিয়া নিলেই তাহাদের দায় মিটিয়া যায়। নির্বাচন শেষে যে দল অধিক সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত হইল তাহারাই সরকার গঠন করে।

দুই দলের সুবিধা :

কিন্তু দুইটি মাত্র দল থাকার অসুবিধা এই যে দুইটি দল আইনসভায় দুইটি মাত্র মত প্রকাশ করে ও এই দুই মতের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু জনসাধারণের দুইটির বেশী মত থাকিতে পারে। অন্য মতবাদের প্রকাশ ও প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এক্ষেত্রে আইন সভা পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক হয় না। সুতরাং দেশে বহু মত থাকিলেবহু দলও থাকা দরকার। দুইটি দল নির্বাচকদের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। এমন যথেষ্ট সংখ্যক নির্বাচক থাকিতে পারে যাহারা এই দুইটি মত ও দলের

দুই দলের অসুবিধা

কোনটিই সমর্থন করে না। কিন্তু মাত্র দুইটি দল থাকিলে তাহাদের ঐ দুই দলের মধ্য হইতে কোন একজন প্রার্থীকে বাধ্য হইয়া ভোট দিতে হয়।

বহু মত থাকিলে বহু দলও থাকা আবশ্যক। তবে বহু মত সাধারণ নির্বাচককে বিভ্রান্ত করিতে পারে এবং সে মত ও দল নির্বাচনে অসুবিধায় পড়ে।

বহু দলের সুবিধা ও অসুবিধা

তাহা ছাড়া, বহু দল থাকিলে এমন হইতে পারে যে কোন দলই আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। তখন যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন আবশ্যক হইয়া উঠিতে পারে। যুক্ত মন্ত্রিসভা মতানৈক্যের ফলে দুর্বল হইতে বাধ্য এবং এরূপ মন্ত্রিসভা বা সরকার স্থায়ী হয় না। সুতরাং, বহু দল অথবা দুই দল অপেক্ষা, অনেকের মতে, অল্প কয়েকটি সুগঠিত দল থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

একদলীয় শাসন (One Party System) :

একদলীয় শাসনের পক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে একটি মাত্র দল থাকিলে জাতীয় সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। বহু দলের অস্তিত্ব জাতীয় ঐক্য ও শক্তি নষ্ট করে। বহু দল জাতির মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে। দল থাকিলেই (সংখ্যা যাই হোক) জনসাধারণ দলীয় নেতার নির্দেশে পরিচালিত হয় এবং দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকা অসম্ভব। সুতরাং, জাতীয় ঐক্য ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য বহু দল অপেক্ষা এক দলই বাঞ্ছনীয়।

স্বপক্ষে যুক্তি

তবে একদলীয় শাসনের পক্ষে যে যুক্তিই দেখান হোক, একদলীয় শাসন সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে না। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একাধিক দল থাকা অপরিহার্য। তবে কোন জাতীয় বিপদের সময়ে বিভিন্ন দল তাহাদের বিভেদ ভুলিয়া সাময়িকভাবে এক দল গঠন করিয়া একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। জনসাধারণের স্বেচ্ছিক সমর্থনেই একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হইতে পারে। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাহাদের পূর্ব বিভেদ ভুলিয়া গিয়া যে জাতীয় সরকার (National Government) স্থাপন করিয়াছিল তাহা উপরোক্ত রূপ একদলীয় শাসন।

জাতীয় বিপদের সময় বিভিন্ন দল মিলিয়া একদলীয় সরকার গঠন করিতে পারে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর য়ুরোপে সোবিয়েৎ রাশিয়ায়, তুরস্কে, ইটালিতে ও জার্মানীতে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এসকল দেশে এক দল বল প্রয়োগে অন্য সকল দলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ইটালি ও জার্মানীতে একদলীয় সরকার এখন আর নাই। রাশিয়াতে সাম্যবাদীদের একদলীয় শাসন এখনও বর্তমান। দেশের সর্ববিধ উন্নতি সাধন করিয়া এ সরকার জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়াছে। নীতিগতভাবে একথা বলা যায় যে এ সরকারের ভবিষ্যৎও জনকল্যাণার্থে গঠনমূলক কর্মের সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল।

রাশিয়া, তুরস্ক, ইটালী, ও জার্মানীর উদাহরণ

প্রশ্নাবলী

১। রাজনৈতিক দল বলিতে কী বোঝ? রাজনৈতিক দল ও কুচক্রী দলের পার্থক্য কী?

(What is a Political Party? Distinguish between a Political Party and a Faction.)

২। রাজনৈতিক দলের কাজ কী কী এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দলের উপকারিতা কী?

(What are the functions of a Political Party and how is it useful in a Democracy?)

৩। এক দল, দুই দল ও বহুদল প্রথার দোষ-গুণ আলোচনা কর।

(Discuss the advantages and disadvantages of one party, two-party and multiple-party systems.)

॥ জনমত ॥

(Public Opinion)

জনমত কাহাকে বলে (What is Public Opinion) : সাধারণ অর্থে, সামাজিক কোন সমস্যা সম্পর্কে সমাজ বা জনগণ যে মত পোষণ করে তাহাকেই জনমত (Public Opinion) বলা হয়। তবে জনমত সংখ্যাগত ভাবে সকল জনের মত নয়। কারণ, সকল সমস্যা সম্পর্কেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে এবং কোন ব্যাপারেই সকল ব্যক্তি এক মত হয় না। অপর দিকে, জনমত বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও বুঝায় না। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার কথা বিস্মৃত হইয়া অধিকাংশ লোক যদি আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কোন মত পোষণ ও প্রকাশ করে তবে তাহা জনমত নয়। এমনও হইতে পারে যে সংখ্যালঘু দল সর্বজনকল্যাণকর কোন মত গ্রহণ ও প্রকাশ করিলে সেই মতই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। তবে, আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই সাধারণতঃ জনমত বলিয়া পরিগণিত হয়।

জনমত কি ?

সর্বজন ও সর্বশ্রেণীর কল্যাণ ও স্বার্থ চিন্তা করিয়া যে মত গঠিত ও প্রচলিত হয় তাহাই প্রকৃত জনমত।

কোন মত স্বল্পসংখ্যক জ্ঞান, যুক্তি ও চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং পরে তাহা সমাজে ছড়াইয়া পড়ে ও অপর সকলের দ্বারা গৃহীত হয়।

জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public Opinion) : আধুনিক গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব যথেষ্ট। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সাফল্য সচেতন, শিক্ষিত ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে। ("An alert and intelligent Public Opinion is the first essential of Democracy".) প্রকৃত গণতন্ত্র বলিতে কার্যতঃ জনমত অনুযায়ী পরিচালিত শাসন-ব্যস্থাকেই বুঝায়। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রপ্রণীত আইনসমূহ দ্বারা নাগরিকদের জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের আইনসমূহ জনমতেরই প্রতিফলন। কোন আইনের পিছনে যদি জনগণের সমর্থন না থাকে, তবে সে আইনের মর্যাদা থাকে না ও তাহা

গণতন্ত্রে জনমতের প্রভাব

পালিত হয় না। জনমত প্রকাশের আধুনিক মাধ্যমসমূহ—সভাসমিতি, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, প্রচার-পুস্তিকা, বিদ্যায়তন প্রভৃতি—আইনসভার উপর যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার করে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায় (Organs of Public Opinion) :

সংবাদপত্র : জনমত নানা উপায়ে গঠিত ও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং জনমত প্রকাশেরও সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম সংবাদপত্র। সংবাদপত্র দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেষণ করিয়া জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে সম্পাদকের নিকট পাঠকবর্গের চিঠিপত্র এবং সংবাদ পরিবেষণের বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা জনমত গঠনে সহায়তা করে। সংবাদপত্র সঠিক সামাজিক দায়িত্ব পালন করিলে যেমন সঠিক জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে তেমনই আবার সংবাদপত্র যদি নিরপেক্ষ না হয় বা সংগঠনমূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হয় বা কায়েমী স্বার্থের প্রভাব-মুক্ত না হয়, তবে জনসাধারণকে বিভ্রান্তও করিতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও কৌতুহল বাড়ার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সংবাদপত্রের প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে।

জনমত গঠন ও প্রকাশে সংবাদপত্রের গুরুত্ব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ : জনমত গঠনে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব অপরিসীম। দেশের ভাবী নাগরিকগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নানাবিষয়ে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ করে এবং এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদের আশা-আদর্শ ও প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা গড়িয়া উঠে। এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা দ্বারা নাগরিকগণের সারাজীবন এক বলিষ্ঠ মতামতে প্রভাবান্বিত করে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

জনমত গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব উপলব্ধি করিয়া একনায়কতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে পরবর্তী জীবনে জনসাধারণ যথোপযুক্ত ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

রাজনৈতিক দল : প্রত্যেক রাজনৈতিক দল জনসমর্থন লাভের আশায় নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক দলসমূহে মতবাদ প্রচার ও বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন জনমত গড়িয়া উঠে।

রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

বেতার ও চলচ্চিত্র ঃ আধুনিক কালে বেতার ও চলচ্চিত্র প্রচার কার্যের জন্য শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে এবং জনমত গঠনে ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

বেতার ও চলচ্চিত্রের প্রভাব

আইনসভায় আলোচনা ঃ আইন সভায় দেশের বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত ও বহু তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ফলে জনসাধারণ নানা রাজনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহিত হয় এবং আলোচনা অনুসারে নিজেদের মতামত গঠন করে। বিভিন্ন দলের সভ্যেরা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে তাহাদের সমর্থক জনমণ্ডলীর মতামতই প্রকাশ করে।

আইন সভায় আলোচনার প্রভাব

প্রশ্নাবলী

১। জনমত বলিতে কী বোঝ? কী কী ভাবে আধুনিক কালে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়?

(**What do you mean by Public Opinion ? How is Public Opinion formed and expressed in modern times ?**

২। গণতান্ত্রিক সরকার ও আইন প্রণয়ন কী ভাবে জনমত দ্বারা প্রভাবিত হয়?

(**How does Public Opinion influence Democratic Government and Legislation ?)**

॥ ভোটাধিকার ॥

(Suffrage or Franchise)

ভোটাধিকারের গুরুত্ব (Importance of Franchise) : আধুনিক গণতন্ত্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন পরিচালনা করেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচন বা ভোটদানই নাগরিকগণের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক অধিকার।

গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার

একবারের নির্বাচিত প্রতিনিধি পরবর্তী নির্বাচনে নাগরিক-সাধারণের ভোট না পাইতে পারেন—এই আশংকায় তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন না। নাগরিকগণের ভোটাধিকার আছে বলিয়াই তাহারা শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও সরকারকে তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে বাধ্য করিতে পারে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটাধিকারের ভিত্তি কী হইবে এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। নানা মতবাদের মধ্যে দুইটি মতই প্রধান : (১) একটি মত অনুসারে রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। **প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (বা সার্বিক) নাগরিকের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage)** অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবল সমর্থন লাভ করে। (২) দ্বিতীয় মত অনুসারে বিদ্যা বা সম্পত্তিগত বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত।

ভোটাধিকারের ভিত্তি

সার্বিক ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Universal Adult Suffrage) : এ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দিকেই যুক্তি আছে। এ মতবাদের পক্ষে যুক্তি দেখান হয় যে ভোটাধিকার সকলের জন্মগত অধিকার। জনসাধারণে ন্যস্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বজনের ভোটাধিকারেই রূপায়িত হইতে পারে। দেশের শাসন ব্যবস্থার সহিত সকলের হিতাহিত জড়িত। সুতরাং সকলেরই ভোট দিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার থাকা উচিত। অন্যদিকে যাহাদের ভোট না থাকে তাহারা স্বভাবতই দেশের শাসন

জন্মগত অধিকার

পরিচালনা ব্যাপারে অসন্তোষ বা ঔদাসীন্য বশতঃ নিরুৎসাহ থাকে এবং আপন আপন নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় না। ফলে শাসকমণ্ডলীও যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয় এবং সহজেই তাহাদের সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করিতে পারে। সুতরাং, প্রত্যেক নাগরিককে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উৎসাহী করিয়া তুলিতে হইলে এবং সরকারকে সকলের সুযোগ-সুবিধার প্রতি মনোযোগী করিয়া তুলিতে হইলে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

ভোটাধিকারের অব্যবহারে ঔদাসীন্য ও শিথিলতা আনে

নীতিগত ভাবে ভোটাধিকার থাকায় বা না থাকায় নাগরিকগণের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহা গণতন্ত্রের মৌলিক সাম্য-নীতির বিরোধী। সুতরাং, এ বৈষম্য দুর করিয়া রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য

বিপক্ষে যুক্তি (**Arguments against Universal Adult Suffrage**): যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গোষ্ঠী গণতন্ত্রকেই নির্বুদ্ধি, অযোগ্য ও অকর্মণ্যদের শাসন বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের বিরোধী।

তাঁহাদের যুক্তিও এই যে অযোগ্য জনসাধারণ যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের সকলের ভোটাধিকার থাকা উচিত নহে।

বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব

তাঁহাদের মতে, ভোটাধিকার লাভের জন্য শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান থাকা উচিত। যাহাদের সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষা আছে, তাহারাই ভোটাধিকার পাইবে। শিক্ষা না থাকিলে জনসাধারণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না বা সে সমস্ত সমস্যার যথোচিত সমাধানও বাহির করিতে পারে না। ইংরেজ দার্শনিক মিলের মতে সাধারণের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা আবশ্যক। (Universal education must precede Universal enfranchisement.)

শিক্ষার নির্দিষ্ট মান থাকা উচিত

শিক্ষার মান দ্বারা ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করার বিরুদ্ধে এ যুক্তি প্রদর্শন করা যায় যে লেখাপড়া না জানিলেও এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান হইতে পারে এবং লেখাপড়া সাধারণ ভাবে জানিয়াও এক ব্যক্তি বুদ্ধিহীন হইতে পারে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রাধীন সকলকে শিক্ষিত করিয়া তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন না করার ফলে কেহ অশিক্ষিত থাকিলে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহাকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

শিক্ষা দান রাষ্ট্রের দায়িত্ব

কাহারো কাহারো মতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির অধিকার দিয়া ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করা উচিত; সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির অধিকার না থাকিলে ভোটাধিকার থাকিবে না। কারণ, সম্পত্তির অধিকারী হইলে মানুষের মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সদগুণ বিকশিত হয় এবং রাষ্ট্রিক জীবনেও তাহার আচরণে ঐ গুণগুলি প্রতিফলিত হইবে। সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দিলে তাহারা দায়িত্বহীন ভাবে কর বৃদ্ধি সমর্থন বা সাধন করিতে পারে। কারণ, করবৃদ্ধিতে তাহাদের কোন লোকসান নাই। তবে সম্পত্তির অধিকার দ্বারা ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করার যুক্তি এখন কেহই স্বীকার করে না।

নির্দ্দিষ্ট পরিমান সম্পত্তি

মোটের উপর, আধুনিক বহু রাষ্ট্রে সার্বিক ভোটাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তবে কোন দেশেই কার্যতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার নাই। কোন দেশেই নাবালক, পাগল, দেউলিয়া ও গুরু অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নাই। কোন কোন দেশে (যেমন সুইজারল্যাণ্ডে) এখনও স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নাই।

সার্বিক ভোটাধিকার বাঞ্ছনীয়

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Female Suffrage): স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার মূলতঃ সার্বিক ভোটাধিকার-সমস্যারই অংশ বিশেষ। সকলের ভোটাধিকার থাকা উচিত কিনা এ সমস্যা ভাবিতে গিয়াই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত কিনা এ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

যাঁহারা স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না, তাঁহাদের মতে স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্র গৃহ; অতএব রাজনীতিতে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা গৃহকর্ম উপেক্ষা করিলে সমাজের ক্ষতি হইবে। তাহা ছাড়া, স্বামীর সহিত একমত হইলে স্ত্রীর ভোটাধিকার

সামাজিক ক্ষতি

এবং ভিন্ন মত নিষ্প্রয়োজন হইলে স্ত্রীর ভোটাধিকারের ফলে গৃহ ও দাম্পত্যজীবন অশান্তিময় হইবে।

কিন্তু যেহেতু প্রমাণিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে এবং রাষ্ট্রাধীন স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত জনসমষ্টি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক, সেইজন্য মনে করা হয় যে, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার পাইতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ স্ত্রীজাতির স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ভোট মারফত শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার থাকা উচিত। তাছাড়া, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য পুরুষের ভোটাধিকার প্রয়োজন হইলে স্ত্রীলোকদেরও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ভোটাধিকার থাকা প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের ভোটাধিকার থাকিলে পারস্পরিক আলোচনায় উভয়েরই বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে মতামত সুস্পষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ফলে রাজনীতির কলুষ ও রূঢ়তা কমিয়া যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত

ভারতবর্ষে ভোটাধিকার (Suffrage in India): ভারতীয় সংবিধানে সার্বিক ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসন কালে ভোটাধিকার শিক্ষা ও সম্পত্তির মান দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্বার্থের বিশাল জনসমষ্টির সকল শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার থাকা প্রয়োজন। তবে জনসাধারণের অশিক্ষা ও নির্বাচক সংখ্যার বিশালতা ভারতবর্ষে সার্বিক ভোটাধিকার দানের বিপক্ষে বিবেচ্য ছিল। কিন্তু গত দুই সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২ ও ১৯৫৭) ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে। সার্বিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তন ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনকে উত্তরোত্তর আরও সহজসাধ্য ও সফল করিয়া তুলিবে, আশা করা যায়।

ভারতীয় সংবিধানে সার্বিক ভোটাধিকার স্বীকৃত

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দানের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

(State the arguments for and against Universal Adult Suffrage.)

২। 'সার্বিক ভোটাধিকার দানের পূর্বে সার্বিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক।'—এ উক্তি আলোচনা কর।

(Universal education must precede Universal Enfranchisement—Discuss.)

৩। (ক) স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার, এবং (খ) ভারতবর্ষের ভোটাধিকার সম্বন্ধে টিপ্পনী লিখ।

(Write short notes on (a) Female Suffrage and (b) Suffrage in India,)

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

CALCUTTA UNIVERSITY PRE-UNIVERSITY

QUESTIONS—1961

Full marks—100

Group A

1. Describe the advantages of division of labour and point out its limitations. (৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What is Capital ? What are the factors upon which the accumulation of capital depends ? (৩১-৩৩ পৃষ্ঠা দেখ)

3. Distinguish between *elastic* and *inelastic* demand. Is the demand for the following elastic or inelastic ?—
(*a*) rice, (*b*) diamonds and (*c*) motor cars. (৬৮ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Explain how price is determined in the market under conditions of competition. (৬৯-৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

5. State the functions of a Central Bank. (৫৭ পৃষ্ঠা দেখ)

6. What are the aims and objectives of India's Five-Year Plans ? (৯৮-১০৪ পৃষ্ঠা দেখ)

Group B

7. What do you mean by the following terms ?—
(*a*) State, (*b*) Government, (*c*) Nation and (*d*) Nationality
(১২০, ১২১, ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ)

8. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of these two would you prefer, and why ? (১৩৪-৩৫ ও ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)

9. Describe the rights and duties of citizens. (১৬২-৬৪ পৃষ্ঠা দেখ)

10. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Indicate their respective merits and demerits. (১৪২-৪৫ পৃষ্ঠা দেখ)

11. Which would you prefer, a unicameral or a bicameral legislature ? Give reasons for your preference. (১৫০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

12. Define Political Party. Describe the functions of political parties in a modern democracy. (১৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS
BURDWAN UNIVERSITY ENTRANCE
QUESTIONS—1961

Full marks—100

Answer *six* questions—*three* from each group.

Group A

1. Explain the concept of 'National Income'. How is such income calculated ? (১৬-১৭, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

2. What is elasticity of demand ?—Distinguish between elastic and inelastic demand. What are the factors which influence such elasticity ? (৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা দেখ)

3. How is price determined in a market under conditions of perfect competition ? (৬৯-৭২ পৃষ্ঠা দেখ)

4. Distinguish between 'money wages' and 'real wages'. Upon what factors do real wages depend ? (৭৮, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা দেখ)

5. Briefly outline the main features of India's Second Five Year Plan. (৯৯-১০২ পৃষ্ঠা দেখ)

Group B

6. Distinguish between Democracy and Dictatorship. What are the conditions for the success of democracy in a country ?
(১৩৪-৩৫, ১৪৫-৪৬ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)

7. Define Liberty. What are its main safeguards ?
(১৬৯-৭০, ১৭১-৭৩ পৃষ্ঠা দেখ)

8. Define political party. What are the functions of such parties in a democracy to-day ? (১৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা দেখ)

9. Point out the distinction between Parliamentary and Presidential Government. What form of government prevails at the Centre under our new Constitution ? Discuss fully.
(১৪২-৪৫ পৃষ্ঠা দেখ)

10. What is Public Opinion and what are its principal organs ? (১৭৯, ১৮০-৮১ পৃষ্ঠা দেখ)

— —